প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

৩১ তম পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ পরিবেশ বিদ্যা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ ENVS

রচনা

একক 1 ◻ শ্রী অনির্বাণ ঘোষ

একক 2 ◻ ড. বিভাস গুহ

একক 3 ◻ শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জী ও অধ্যাপক বিকাশ ঘোষ

একক 4 ◻ শ্রীমতী টিঙ্কি কর ও অধ্যাপিকা কাজল দে

একক 5 ◻ ড. মমতা দেশাই

একক 6 ◻ শ্রীমতী টিঙ্কি কর

সম্পাদনা

ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ENVS

পরিবেশ বিদ্যা

(স্নাতক পাঠক্রম)

একক 1 ❑ পরিবেশের মৌলিক ধারণা 8 — 20

একক 2 ❑ বাস্তুতন্ত্র 21 — 33

একক 3 ❑ পরিবেশ দূষণ 34 — 64

একক 4 ❑ বিশ্ব পরিবেশ সমস্যা 65 — 92

একক 5 ❑ পরিবেশ আইন 93 — 99

একক 6 ❑ জনসংখ্যা ও পরিবেশ 100 — 128

SYLLABUS FOR ENVIRONMENTAL STUDIES
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

FULL MARKS – 50

1. **Fundamentals of Environment :** Definition and Basic concepts of environmental studies; Components of Physical Environment; Land, Air and Water.

2. **Ecosystem :** Concept, Components of Ecosystem, Ecology, Food Chain and Food Web, Trophic Level, Energy Flow and Productivity in ecosystem, Nutrient Cycles in Ecosystem, Types of Ecosystem.

3. **Environmental Pollution :** Air, Water, Land and Noise Pollution.

4. **Global Environmental Issues :**

   Green House Gases, Green House Effect, Global Warming, Ozone Hole and its Depletion and related phenomena, Acid Rain, El Nino, La Nina, Deforestation, Environmental Movements, Biodiversity and Conservation, Sustainable Development.

5. **Environmental Laws**

6. **Population and Environment**

একক 1 ❑ পরিবেশের মৌলিক ধারণা (Fundamentals of Environment)

1.1 ভূমিকা

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 পরিবেশের সংজ্ঞা

1.4 পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ

1.5 ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা

1.6 পরিবেশ বিদ্যার মৌলিক ধারণা

1.7 প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য

1.8 প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান

1.9 প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন

1.10 অনুশীলনী

1.1. ভূমিকা (Introduction)

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পৃথিবীতে বসবাস করে তাকেই পরিবেশ বলে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বোঝায় প্রকৃতির সমস্ত দান, যেমন— পাহাড়-পর্বত, নদী, বন-জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, জল, মাটি, বাতাস, জীবজন্তু ও মানুষ। পরিবেশের এই উপাদানগুলিই মানুষকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেষ্টিত রাখে।

1.2. প্রস্তাবনা

পরিবেশ বিদ্যা একটি বহুমুখী বিষয়। রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, কৃষি বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকারু বিদ্যা, আইন, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় এর অন্তর্গত। এক কথায় সমস্ত পরিবেশ তার জল, স্থল, অন্তরীক্ষ নিয়ে একদিকে আর মানুষ অন্যদিকে— এ দুয়ের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া এবং তৎ সঞ্জাত ফলশ্রুতি পরিবেশ বিদ্যায় আলোচিত হয়ে থাকে।

তবে পরিবেশবিজ্ঞান ও পরিবেশ বিদ্যার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। পরিবেশ বিজ্ঞানে বীক্ষনাগারের একটা ভূমিকা থাকে। সেখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও তৎসঞ্জাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। আর সেইজন্য বিজ্ঞানের এক বা যুগপৎ একাধিক শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবেশ বিদ্যা সকলের জন্য। এর একটি বড় দিক হচ্ছে সচেতনতা (Awareness)। এই বিদ্যার প্রচার ও অধিপতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ করে ছাত্র সাধারণকে এবং সাধারণভাবে বৃহত্তর মানব সম্পদকে পরিবেশের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও সুব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত করা।

বর্তমান সংকলনটি এই লক্ষ্য নিয়েই পরিকল্পিত হয়েছে। অবশ্য আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীদের পরিবেশবিদ্যার প্রাথমিক স্বশিক্ষণ উপকরণ হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হবে। সেজন্যই এই আলোচনা সম্পূর্ণ পাঠক্রম ভিত্তিক এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে সম্পূর্ণতর সংকল্প প্রকাশে আগ্রহী। অবশ্য এটাও নিশ্চিত যে এই সংকলনের পর্যালোচনা শিক্ষার্থী সাধারণকে সম্পূর্ণতর ও বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবেশ করতে আগ্রহী করবে।

1.3. পরিবেশের সংজ্ঞা (Definition of Environment)

পরিবেশ শব্দটির উৎপত্তি জার্মান শব্দ environ থেকে, যার অর্থ en অর্থে in অর্থাৎ মধ্যে এবং viron অর্থে circuit অর্থাৎ পরিবেষ্টন। অর্থাৎ পরিবেশ বলতে পরিবেষ্টনকারী পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝায়। দ্য কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে (১৯৯২) পরিবেশের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে— ‘‘পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলির সমষ্টি।’’ জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক জৈব, অজৈব ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়ে ওঠে তাকে পরিবেশ বলে। আর্মস (Arms) ১৯৯৪ খ্রিঃ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স নামক গ্রন্থে বলেছেন যে— জৈব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ বিজ্ঞানী বট্‌কিন ও কেলার (Botkin and Keller) ১৯৯৫ খ্রিঃ ‘‘এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স’’ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে। C. C. Park-এর মতে— “Environment refers to the sum total of conditions which surround man at a given point in space and time.” স্থান ও কালের কোন প্রদত্ত বিন্দুতে যেসব অবস্থা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের সমষ্টিগত অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

1.4. পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ (Types of Environment)

প্রকৃতিগত পার্থক্য ও মৌলিক গঠনের উপর ভিত্তি করে পরিবেশকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment) এবং সাংস্কৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ (Cultural or man-made environment) পৃথিবীতে মানুষ আসার আগে ‘সাংস্কৃতিক পরিবেশ’ বলে কিছু ছিল না; যা ছিল, সবই ‘প্রাকৃতিক পরিবেশ’। প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র ও সবসময় মানুষের অনুকূল ছিল না। তাই বৌদ্ধিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল প্রয়োগের দ্বারা প্রয়োজন ও সুবিধামতো প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাকে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলে।

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের শ্রেণিবিভাগ পরপৃষ্ঠায় ছকের আকারে দেখানো হলো —

1.5. ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা (Concept of Physical Environment)

‘প্রাকৃতিক পরিবেশ’ প্রকৃতির সৃষ্টি। পৃথিবীতে জীব জন্মাবার আগে থেকেই ‘প্রাকৃতিক পরিবেশ’ রচিত হয়ে আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় জীবকূলের এমন কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষেরও কোন ভূমিকা বা অবদান নেই। মাটি, জল, মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মাটির গঠন ও প্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী সব কিছু নিয়েই প্রাকৃতিক

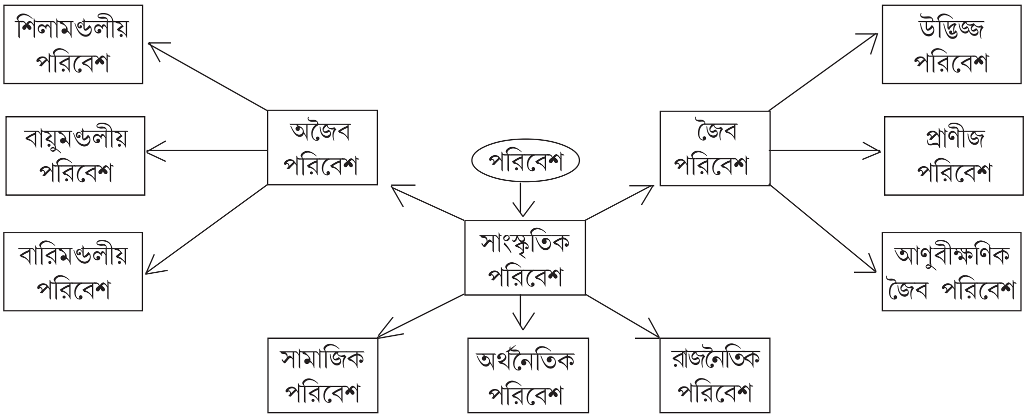

পরিবেশ। এই পরিবেশ তৈরি হতে প্রকৃতির সময় লেগেছে কোটি কোটি বছর। দীর্ঘ সময় ধরে খুব ধীর প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্ত্তন হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে প্রভাবিত করে, তেমনই মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের ওপরও প্রভাব ফেলে। মানুষের নিকট প্রাকৃতিক পরিবেশ দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

(i) জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয় সর্ত হিসাবে

এবং

(ii) সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে।

কৃষি, খনিজ, শক্তি, বনজ দ্রব্য এবং শিল্পবিকাশ সব কিছুরই মূল ভিত্তি হল প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ হল — The landscape before man was fashioned on the earth.

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে এবং মানুষের ক্রিয়া-কলাপেও তারতম্য দেখা যায়।

1.6. পরিবেশ বিদ্যার মৌলিক ধারণা (Basic Concepts of Environmental Studies)

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিষয়ক পাঠই হল পরিবেশবিদ্যা। পরিবেশ বিদ্যায় যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও সমষ্টিগত পরিবেশের কথা বলা হয়, তেমনি এদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাও আলোচনা করা হয়। পরিবেশ চর্চার মূল উদ্দেশ্যই হল পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। অর্থাৎ ভালভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। পৃথিবীতে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগত যাতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য পরিবেশের উপাদানগুলির মান, পরিমাণ, সক্রিয়তা ও ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পরিবেশের সমস্যাগুলির স্বরূপ অনুধাবন করে তার স্থায়ী সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা করতে মানুষকে পরিবেশ মনস্ক করে তুলতে পরিবেশ পাঠের প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে প্রতিটি মানুষ যেন তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়, সে ব্যাপারে সচেতন করতেও প্রয়োজন পরিবেশ পাঠের।

বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক কালে পরিবেশের যে আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে তা সবই ছিল প্রাকৃতিক। আর বর্তমানে যা সারা

বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ সংকট। এর মোকাবিলা যদি না করতে পারা যায় তবে বর্তমান সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য। প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহস্থলী ও শিল্পজাত কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ, বাতাসে যানবাহন ও শিল্প নির্গত গ্যাসীয় পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত নির্গমণ, ব্যাপক হারে অরণ্য ছেদন ইত্যাদির ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের ও আবহমণ্ডলের উষ্ণতামাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পরিবেশ আজ জর্জরিত নানা ধরনের দূষণে (বায়ু, জল, শব্দ, মৃত্তিকা) ও ওজোন স্তরের ধ্বংসসাধনে। মানুষের নিজের সৃষ্টি এই দূষণের প্রতিকার মানুষকেই করতে হবে।

পরিবেশকে বাঁচাতে হলে মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সক্রিয় সহযোগীতার প্রয়োজন। তাই শুধুমাত্র শিক্ষিত এবং পরিবেশমনস্ক মানুষ নয়, শিক্ষার সর্ববিষয়ে এবং সর্বস্তরে পরিবেশ পাঠকে অপরিহার্য করে তুলতে হবে, যা পরিবেশ সংক্রান্ত বর্তমান সমস্যাগুলিকে সনাক্ত করতে ও তার স্থায়ী সমাধান খুঁজে নিয়ে মানবজাতির প্রকৃত সমৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে।

1.7. প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য (Nature of Physical Environment)

(i) **প্রাকৃতিক পরিবেশ সতত পরিবর্তনশীল ঃ** পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ভূ-অভ্যন্তরীণ ভূ-গাঠনিক শক্তি সমূহ ক্রিয়াশীল থাকায় সহনমন ও সংকোচন বলের প্রভাবে মহীখাতে সঞ্চিত পলিরাশিতে চাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ভঙ্গিল পর্বত। পৃথিবীর জন্মলগ্নে ছিল না আবহাওয়া। বিভিন্ন গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক হারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আবার বর্তমানে গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলির মাত্রাতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সততই পরিবর্তনশীল।

(ii) **প্রাকৃতিক পরিবেশ কতকগুলি নিয়মের মাধ্যমে চালিত হয় ঃ** প্রাকৃতিক নিয়ম স্থির ও সুনির্দিষ্ট। মানুষ তার কাজকর্মের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সমূহের মাত্রা ও তীব্রতার পরিবর্তন ঘটালেও প্রাকৃতিক পরিবেশের মূখ্য প্রক্রিয়াসমূহ যথা অর্ন্তজাত ও বর্হিজাত প্রক্রিয়াসমূহ কতকগুলি মৌলিক প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়ম অনুসারে চলে।

(iii) **পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত ঃ** প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠনকারী উপাদানগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হওয়ায় এদের একটির পরিবর্তন ঘটলে অন্যটির উপর তার প্রভাব পড়ে।

(iv) **প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রবণতা হল ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হওয়া ঃ** ভূ-আলোড়নের ফলে ভূমিরূপের যে পরিবর্তন হয় তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রমায়মান প্রক্রিয়াগুলি সব সময় ক্রিয়াশীল থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই তা পুণরায় ভারসাম্যে উপনীত হয়।

(v) **প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রমান নেই ঃ** জায়গাবিশেষে তা সুবৃহৎ, বৃহৎ, মধ্যম এমনকি সুক্ষ্ম বা অনুপরিবেশও হতে পারে।

1.8. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান (Components of Physical Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশ যে যে উপাদান দিয়ে রচিত, সেগুলি তিন প্রকার।

1. অজৈব বা ভৌত উপাদানসমূহ (Abiotic = non-living components)
2. জৈব বা সপ্রাণ উপাদানসমূহ (Biotic = living components)
3. শক্তি উপাদান (Energy components)

নিম্নে কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের অজৈব বা ভৌত উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হল।

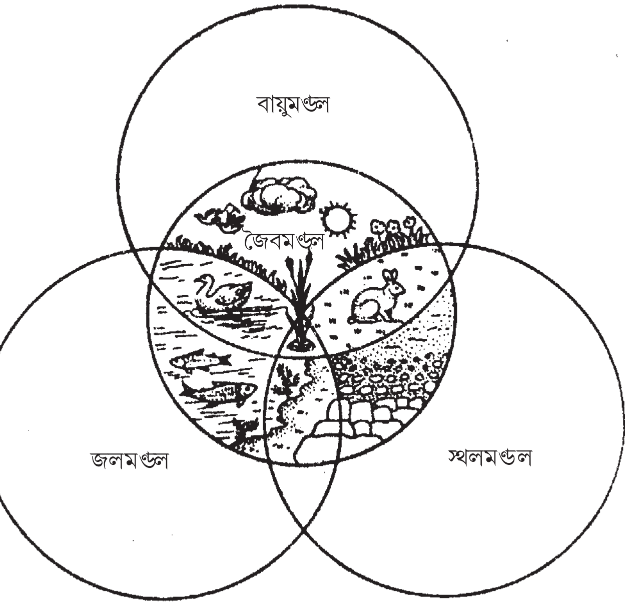

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ

প্রাকৃতিক পরিবেশের অজৈব উপাদানসমূহ তিন প্রকার।

যথা— কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও গ্যাসীয় (Gaseous)।

(i) কঠিন উপাদানে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা— পৃথিবীর কঠিন অংশ যা শিলামণ্ডল (lithosphere) নামে।

(ii) তরল উপাদানে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা— পৃথিবীর তরল অংশ যা বারিমণ্ডল (hydrosphere) নামে এবং

(iii) গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা— পৃথিবীর গ্যাসীয় অংশ যা বায়ুমণ্ডল (atmosphere) নামে পরিচিত।

(i) শিলামণ্ডল (Lithosphere) ঃ কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত পৃথিবীর বহিরাবরণকে শিলামণ্ডল বলে। বিভিন্ন ধরনের শক্ত শিলা দিয়ে ভূত্বক বা শিলামণ্ডল গঠিত। শিলামণ্ডলের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। সমুদ্রের তলদেশে এর গভীরতা মাত্র ৫ কিমি। কিন্তু মহাদেশের অংশে এর গভীরতা প্রায় ৩৫ কিমি। শিলামণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের অংশটি সিলিকা (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত হওয়ায় একে সিয়াল (SIAL) স্তর বলে। মহাদেশগুলি সিয়াল স্তর দ্বারা গঠিত। এই স্তরে গ্রানাইট জাতীয় শিলা দেখা যায়। অন্যদিকে মহাসাগরগুলি সিলা স্তর দ্বারা গঠিত। এই স্তরে ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দেখা যায়। মহাদেশের শিলার ঘনত্ব ও ওজন মহাসাগরের শিলার থেকে কম বলে মহাসাগরগুলির ওপর মহাদেশগুলি ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করছে।

শিলা, মৃত্তিকা ও খনিজ ঃ শিলামণ্ডলের ভূত্বকীয় অংশে উপাদান রূপে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ, শিলা, মৃত্তিকা, ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ। পাহাড় পর্বতের ন্যায় বৃহদায়তন ভূমিরূপ, উদ্ভিদ ও প্রাণির বাসস্থানরূপে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপ প্রভৃতি। সব ধরনেরই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এই শিলামণ্ডলের উপর ক্রিয়াশীল হলেও প্রধানতঃ শিলামণ্ডলীয় উপাদানের পরিবর্তন সংগঠিত হয় দুটি মূল শক্তির দ্বারা। যথা—

(ক) অভ্যন্তরীণ শক্তি, যার ফলে সৃষ্টি হয় ভাঁজ, চ্যুতি, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি এবং (খ) বহিঃশক্তি, যার ফলে ভূত্বকের উপরিভাগে আবহবিকার, পুঞ্জিতস্খলন, নদ-নদী, বায়ুপ্রবাহ হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা ভূত্বকের ধীর পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে।

শিলামণ্ডল

শিলামণ্ডল আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। এই শিলা আবহবিকারের ফলে ও মাটি সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একসময় মাটিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ, ভূত্বকের ওপর শিথিল জৈব রাসায়নিক আবরণকে মাটি বলা হয়— যা পরিবেশের সজীব ও নির্জীব উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলে। রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভকুচেভের মতে মৃত্তিকা হল একটি গতিশীল মাধ্যম। কারণ মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলির পরিবর্তনশীলতা মৃত্তিকার স্বাভাবিক ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটায়।

ভূত্বক গঠনকারী মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম প্রধান। এই আটটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে ভূত্বকের ৯৮ শতাংশ গঠিত। শিলামণ্ডল আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত। আর শিলা তো খনিজ দিয়েই তৈরি। শিলাগঠনকারী প্রধান খনিজ দশটি— কোয়াটম, ফেলস্ফার, অভ্র, কর্দম খনিজ, ক্লোরাইড, হর্নব্লেন্ড, অগাইট, অলিভিন, ক্যালসাইট, ডলোমাইট ও লৌহ আকরিক।

শিলামণ্ডলের গুরুত্ব ঃ (ক) শিলামণ্ডল হল জীবজগৎ ও উদ্ভিদের আবাসস্থল, (খ) মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদের আধার ও উৎস (গ) ভূত্বকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে আছে মৃত্তিকা। উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ পাওয়া যায় এই মৃত্তিকা থেকে। (ঘ) ভূমির প্রকৃতি শিলার বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর এই ভূমির প্রকৃতিই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বহুল অংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) বারিমণ্ডল (Hydrosphere) ঃ পৃথিবীর সব ধরনের জলরাশিকে বারিমণ্ডল বলা হয়। শিলামণ্ডলের যে সব নীচু অংশ জলপূর্ণ হয়ে মহাসাগর, সাগর, নদী, হ্রদ, খাল-বিল প্রভৃতি জলভাগ সৃষ্টি করেছে তাকে একসঙ্গে বারিমণ্ডল বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় ৭১.৪ ভাগ জুড়ে রয়েছে বারিমণ্ডল। সারা পৃথিবী জুড়ে বারিমণ্ডল কোনো-না-কোনো রূপে বিদ্যমান রয়েছেই। 'বারি'-র তিনটি রূপ— জল, বরফ ও জলীয় বাস্প। 'জল-রূপে বিদ্যমানতাই বেশি'। জল হল একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন প্রশম তরল পদার্থ (Ph - 7)।

পৃথিবীতে বারিমণ্ডলের বণ্টন

(ক) বিশ্ব সমুদ্র (World Ocean)	—	97.200	শতাংশ
(খ) ভৌমজলরাশি রূপে	—	00.625	শতাংশ
(গ) নদী, হ্রদ ইত্যাদি রূপে	—	00.024	শতাংশ
(ঘ) বরফরূপে	—	02.150	শতাংশ
(ঙ) জলীয় বাষ্পরূপে (বায়ুমণ্ডলে)	—	00.001	শতাংশ
মোট	—	100.000	শতাংশ

জল বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পুণরায় বায়ুমণ্ডল আবর্তিত হয়। জলের এই বিরামবিহীন চক্রাকার আবর্তনকে জলচক্র (Hydrological cycle) বলে। জলচক্র সম্পাদিত হয় তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যথা— বাস্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপন। এই তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটি বিঘ্নিত হলে জলচক্র ভারসাম্য হারায়। সূর্যতাপে জলভাগ উত্তপ্ত হলে জলে বাষ্পে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প বায়ু দ্বারা জলভাগ ও স্থলভাগের দিকে পরিবাহিত হয়। অনুকূল পরিবেশে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি বা তুষারের আকারে স্থলভাগ ও জলভাগের

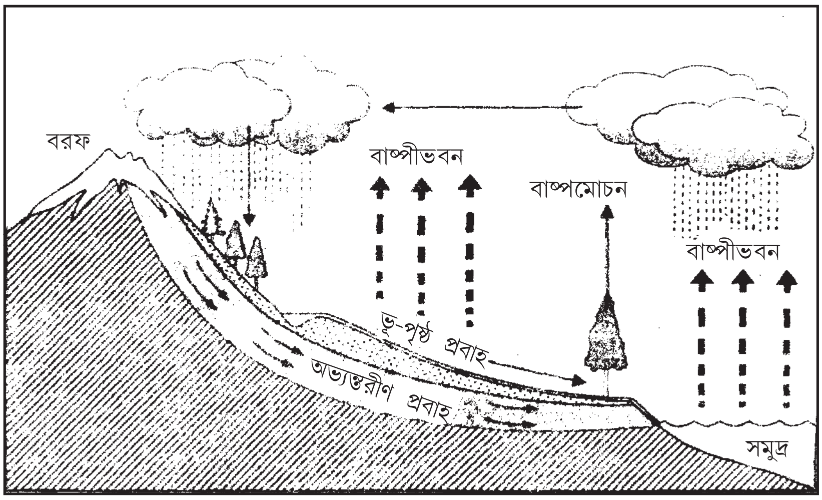

জলচক্র

উপর পতিত হয়। ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানোর পূর্বেই জলের কিছু অংশ বাষ্পের আকারে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বৃষ্টিপাতের এক অংশ মৃত্তিকা শোষণ করে ভৌমজলস্তর গড়ে তোলে আার কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ প্রবাহরূপে সমুদ্রে স্থানান্তরিত হয়। পুনরায় ঐ জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এই ভাবেই প্রকৃতিতে জল চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

জলের গুরুত্ব ঃ বারিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। বারিমণ্ডল বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের রসায়নাগার, মানবজাতির কাছে বারিমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বারিমণ্ডলের গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হল।

(ক) জীবদেহ গঠনে জল অপরিহার্য। জীবদেহ গঠনকারী উপাদানগুলির মধ্যে জলের পরিমাণই ৭০ শতাংশ। (খ) জীবমণ্ডলে জলের সমতা রক্ষা হয় জলচক্রের মাধ্যমে যা বারিমণ্ডলের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। (গ) বারিমণ্ডল জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ভাণ্ডার। বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, ক্রিল, ফার্ণ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে সমুদ্রে জন্মায়। (ঘ) বারিমণ্ডল বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ও জ্বালানি দ্রব্যের ভাণ্ডার। (ঙ) চিরাচরিত ও অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তির উৎসও বারিমণ্ডল। (চ) জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বারিমণ্ডলের ভূমিকা অবর্ণনীয়। (ছ) জলপথে সুলভে পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করা যায় বলে হ্রদ, নদী, সাগর, মহাসাগরগুলিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জলপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। (জ) বারিমণ্ডল মানুষের কর্মসংস্থানের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে বহুলোক সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

(iii) বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) ঃ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার ওপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান ঃ বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ তিনটি উপাদানে গঠিত, যথা —

(ক) গ্যাসীয় উপাদান
(খ) জলীয় বাষ্প এবং
(গ) জৈব ও অজৈব উপাদান।

(ক) **গ্যাসীয় উপাদান ঃ** বায়ু হল বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। বিশুদ্ধ বায়ুর প্রধান উপাদানগুলি হল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যেমন আর্গন, হিলিয়াম, জেনন, ক্রিপ্টন প্রভৃতি। নিচের সারণিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমাণ দেওয়া হল।

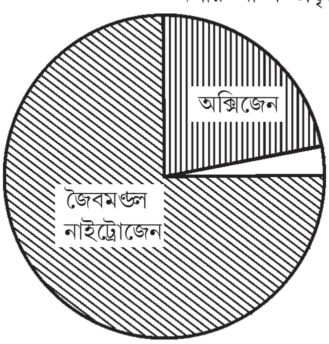

বায়ুর গ্যাসীয় উপাদান

	উপাদান	প্রতীক	পরিমাণ (% শুষ্ক বায়ুতে)
1.	নাইট্রোজেন	N_2	78.080
2.	অক্সিজেন	O_2	20.940
3.	আর্গন	A	0.930
4.	কার্বন ডাই-অক্সাইড	Co_2	0.030
5.	নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন	Ne, He, Kr, Xe	0.003
6.	জলীয় বাষ্প		

বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের গুরুত্ব ঃ

নাইট্রোজেন ঃ ইহা একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই গ্যাস সরাসরি প্রাণীজগৎ ব্যবহার করে না। অনেক ব্যাকটেরিয়া এবং মটরশুঁটি, ছোলা জাতীয় উদ্ভিদ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

অক্সিজেন ঃ বায়ুমণ্ডলের সমস্ত গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেনের গুরুত্ব সবথেকে বেশি। জীবজগৎ প্রশ্বাসের সাহায্যে

অক্সিজেন গ্রহণ করে ও নিশ্বাসের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। তাই অক্সিজেন ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব হত না। অক্সিজেনের সাহায্যে আগুণ জ্বালানো সম্ভব হয়। এই গ্যাসের মাধ্যমে অক্সিডেশান পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিলায় রাসায়নিক আবহবিকার ঘটে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ খুব কম থাকলেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। এর সাহায্যে উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে এবং প্রাণিজগৎ ঐ উদ্ভিদজাত খাদ্য গ্রহণ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড তাপ শোষণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত শহর ও নগরের বৃদ্ধি, কলকারখানার বিকাশ, বিভিন্ন যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকারখানার ধোঁয়া, কয়লা ও খনিজ তেলের ধোঁয়া ও গ্যাস, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, রাসায়নিক গ্যাসের ব্যবহার প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে।

ওজোন ঃ বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ খুব কম হলেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ওজোন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা বিভিন্ন ক্ষতিকারণ রশ্মিকে শোষণ করে জীবজগতকে রক্ষা করে।

(খ) জলীয় বাষ্প ঃ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের পরেই জলীয় বাষ্পের স্থান। ইহা বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, উষ্ণতার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির জন্যই ঘনীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুহিন ও তুষার সৃষ্টি হয়। উর্দ্ধাকাশে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনে সৃষ্ট লীনতাপ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটায়। জলীয় বাষ্প উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) ধূলিকণা ঃ বায়ুমণ্ডলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ধূলিকণা, মরু অঞ্চল ও সমুদ্রতীরের অতি সূক্ষ্ম ধুলো-বালি, অতিক্ষুদ্র খনিজ লবণ, বিভিন্ন কলকারখানার পোড়া কয়লার ছাই, আগ্নেয়গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত ছাই, ভস্ম প্রভৃতি ধূলিকণারূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। এদের একত্রে অ্যারোসল (Aerosol) বলে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বিভিন্ন ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় ও মেঘ-বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর ঃ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) রাসায়নিক গঠন অনুসারে, (খ) উষ্ণতা অনুসারে স্তরবিন্যাস।

U. S. A. র জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থা (নাসা)র সমীক্ষা অনুযায়ী রাসায়নিক গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ দুটি স্তরে বিভক্ত—

(১) হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল এবং

(২) হেটেরোস্ফিয়ার বা বিষমমণ্ডল।

(১) হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল ঃ ভূপৃষ্ঠ হতে ওপরের দিকে ৯০ কিমি পর্য্যন্ত অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন এবং বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত প্রায় একই রকম থাকে, তাই এই স্তরকে বলা হয় হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল।

(২) হেটোরোস্ফিয়ার বা বিষমণ্ডল ঃ হোমোস্ফিয়ার স্তরের ওপরে বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধসীমা অর্থাৎ ১০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত এবং বিভিন্ন গ্যাসের স্তরগুলি একই রকম থাকে না, তাই এই স্তরকে হেটেরোস্ফিয়ার বা বিষমমণ্ডল বলে। রাসায়নিক গঠন অনুসারে এই স্তরকে চারটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(a) **হাইড্রোজেন স্তর** — বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বসীমা ১০,০০০ কিমি থেকে নীচে ৩,৫০০ কিমি পর্য্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ হাইড্রোজেন পরমাণু স্তর দ্বারা গঠিত।

(b) **হিলিয়াম স্তর** — হাইড্রোজেন স্তরের নিচে ৩,৫০০ কিমি থেকে ১০০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা গঠিত।

(c) **পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর** — হিলিয়াম স্তরের নিচে ১,০০০ কিমি থেকে ২০০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ অক্সিজেন দ্বারা গঠিত।

(d) **আণবিক নাইট্রোজেন স্তর** — পারমাণবিক অক্সিজেন স্তরের ঠিক নিচে ২০০ কিমি থেকে হোমোস্ফিয়ারের সীমানা ৯০ কিমি পর্যন্ত অঞ্চল প্রধানতঃ নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত।

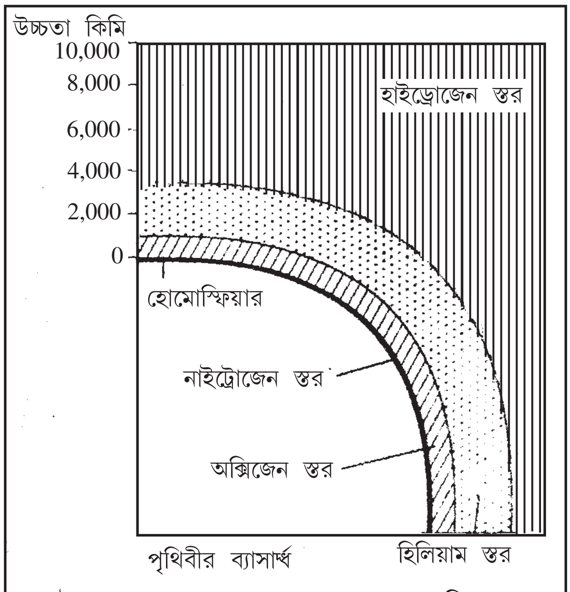

উপাদানের তারতম্যভেদে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

(খ) উষ্মতা অনুসারে স্তরবিন্যাস ঃ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে উষ্মতার তারতম্য দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই বায়ুমণ্ডলের উষ্মতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। উষ্মতা অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনেটোস্ফিয়ার, — এই ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(a) **ট্রপোস্ফিয়ার বা ক্ষুব্ধমণ্ডল ঃ** এই স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবথেকে নিচের স্তর। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৮ কিমি পর্যন্ত ওপরের বায়ুস্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলে। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১৮ কিমি হলেও মেরু অঞ্চলে ইহা ৮৯ কিমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের প্রায় ৭৬% এবং সমস্ত প্রকার জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা এই স্তরেই দেখতে পাওয়া যায়। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত, ঝড়, শিশির, কুয়াশা সহ সমস্ত প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই স্তরেই দেখা যায় বলে একে ক্ষুব্ধমণ্ডল বলে। এই স্তরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এই তাপমাত্রা হ্রাসের হার সাধারণভাবে প্রতি ১০০ মিটার উচ্চতায় ০.১° সেন্টিগ্রেড বা প্রতি ১০০০ মিটার (১ কিমি) উচ্চতায় ৬.৫ সন্টিগ্রেড। ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল ট্রপোজ নামে পরিচিত।

(b) **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডল ঃ** ট্রাপোপজের ওপরে ৫০ কিমি পর্যন্ত বায়ুস্তরটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। এই বায়ুস্তরে অতি সূক্ষ্ম ধুলিকণা ছাড়া কোনরকম জলীয় বাষ্প থাকে না, ফলে আবহাওয়া শান্ত থাকে। এইজন্য এই স্তরকে শান্তমণ্ডল বলে। ঝড় বৃষ্টি থাকে না বলেই এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণতঃ জেট বিমানগুলি চলাচল করে। বায়ু প্রবাহিত হয় না বলে এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণতঃ জেট বিমানগুলি চলাচল করে। বায়ুপ্রবাহ থাকে না বলে জেটবিমানের ইঞ্জিন নির্গত ধোঁয়া পুঞ্জাকারে সাদা দাগের আকারে দেখা যায়। এই স্তরে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এই স্তরে ওজোন গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে দেখা যায়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে স্ট্র্যাটোপজ বলে।

(c) **মেসোস্ফিয়ার ঃ** স্ট্র্যাটোপজের ওপর ৮০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরেও ট্রপোস্ফিয়ারের মতো উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে উষ্মতা হ্রাস পায়। মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলির অধিকাংশ এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়। মেসোস্ফিয়ারের ওপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোপজ বলে।

(d) **থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার ঃ** মেসোপজের ওপরে প্রায় ৫০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে থার্মোস্ফিয়ার বলা হয়। এই অংশে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই অংশে বায়ুস্তর অত্যন্ত

হাল্কা। তীব্র সৌরবিকিরণে রঞ্জনরশ্মি ও অতি বেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়। তাই এই স্তরকে আয়নোস্ফিয়ার বলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। ফলে পৃথিবীতে বেতার সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই স্তরে বিভিন্ন তড়িতাহত অণুর চৌম্বক বিক্ষেপের ফলে অণুগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংস্পর্শে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে একপ্রকার উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণ দেখা যায়, একে মেরুজ্যোতি বলে। সুমেরু অঞ্চলের মেরুজ্যোতিকে সুমেরুপ্রভা বা আরোয়া বোরিয়ালিস এবং কুমেরু অঞ্চলের মেরুজ্যোতিকে কুমেরুপ্রভা বা আরোরা অস্ট্রালিস বলে।

(e) **এক্সোস্ফিয়ার ঃ** থার্মোস্ফিয়ারের ওপরে প্রায় ৭৫০ কিমি পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরেও উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

(f) **ম্যাগনেটোস্ফিয়ার ঃ** এক্সোস্ফিয়ারের ওপরে বায়ুমণ্ডলের কোশ সীমা পর্যন্ত বায়ুস্তরকে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার

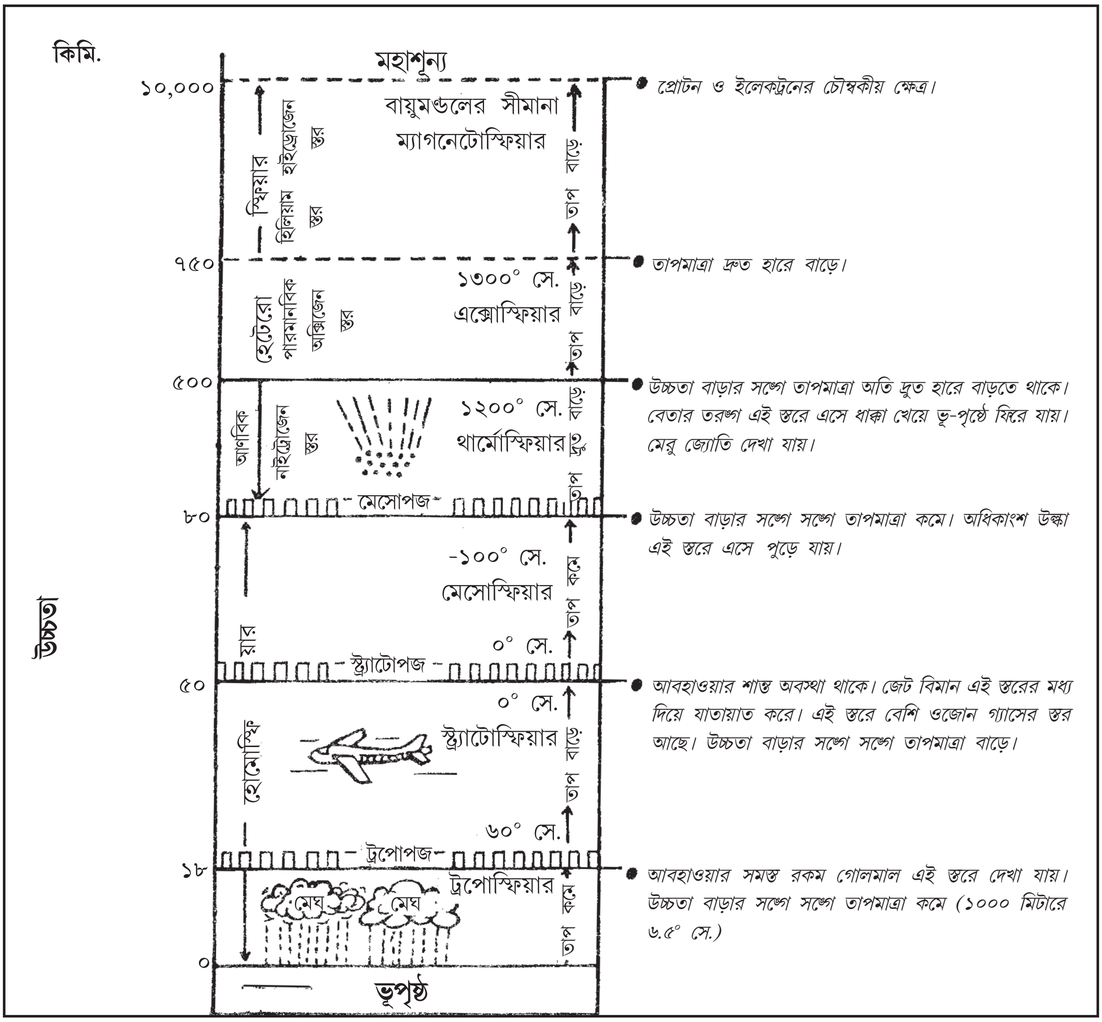

বলে। এই স্তরে বায়ুমণ্ডলকে বেষ্টন করে একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই স্তর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব ঃ পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমণ্ডলের জন্যই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। জল, বাতাস প্রভৃতির উৎস হল বায়ুমণ্ডল। প্রাণীজগৎকে অক্সিজেন ও উদ্ভিদজগৎকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের তাপ শোষণে, জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনে সাহায্য করে। জলীয় বাষ্পে মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত ও কুয়াশার সৃষ্টি করে।

1.9. প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন (Changes in Natural Environment)

(i) **ধীরগতি পরিবর্তন ঃ** আমাদের পরিবেশ চিরপরিবর্তনশীল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশগুলি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্ত্তনগুলি অতি ধীরে ধীরে বহু কোটি বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যেমন— আজ থেকে প্রায় ৫০-৬০ কোটি বছর আগে সমস্ত মহাদেশগুলি একসঙ্গে ছিল, পরে প্রাকৃতিক কারণে মহাদেশগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপমাত্রার পরিমাণ জন্মলগ্ন থেকে একইরকম ছিল না। এগুলির ধীরে ধীরে পরিবর্তনের সাথে সাথে জীববৈচিত্র্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

(ii) **দ্রুতগতি পরিবর্তন ঃ** কয়েক হাজার বছরের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে। জলাশয়ের পরিবেশে আদিযুগে ছিল কিছু নিমজ্জিত উদ্ভিদ, তারপরে পর্যায়ক্রমে এসেছে ভাসমান উদ্ভিদ, ও নানান শ্রেণির জলজ উদ্ভিদ। ক্রমশঃ এই সমস্ত মৃত উদ্ভিদের জৈবপদার্থ জমতে জমতে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ও শেষে মহীরূহ জন্মায় এবং সর্বোপরি পরিণত নিবিড় অরণ্য গড়ে ওঠে।

(iii) **আকস্মিক পরিবর্তন ঃ** আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থাৎ ভূকম্পনে, অগ্ন্যুৎপাতে, বন্যা, ও সাইক্লোনে কোন স্থানের পরিবেশ তথা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটে।

(iv) **মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তন ঃ** ওপরের পরিবর্ত্তন তিনটিই হল প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশের পরিবর্ত্তন। কিন্তু সভ্যতার সূচনা থেকে মানুষ যখন ঘর তৈরী করল এবং বসতির জন্য গড়ে তুলল ছোট ছোট গ্রাম ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পরিবর্তিত হল ছোট শহর থেকে বড় শহরে, তখনই প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তৈরী হল মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ। মানুষকে তার খাদ্যের জন্য, ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য, কলকারখানা চালানোর জন্য কৃষিজ, বনজ সম্পদ, জ্বালানি কাঠ, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ পদার্থকে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হল। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পদ হানি ঘটল। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিটি সম্পদেরই একটি নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা আছে, যাকে বলা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশের বহন ক্ষমতা (Carrying capacity of Natural Environment), মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই বহন ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেলে মানুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এককথায় বলা যায় জীবমণ্ডলের ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশ ও ক্রমাবনতির চাবিকাঠি রয়েছে মানুষেরই হাতে। মানুষের সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ যেমন বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে, তেমনি মানুষেরই যথেচ্ছ কার্য কলাপ বাস্তুতন্ত্রকে ভঙ্গুর করে তুলবে।

1.10. অনুশীলনী

(ক) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ

(১) পরিবেশ কাকে বলে?
(২) পরিবেশকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়।
(৩) প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝ?
(৪) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি কি কি?
(৫) 'সিয়াল' বলতে কী বোঝ?
(৬) 'সিমা' কাকে বলে?
(৭) বারিমণ্ডল কাকে বলে?
(৮) বায়ুমণ্ডল কাকে বলে?
(৯) বায়ুমণ্ডল কীসের দ্বারা গঠিত?
(১০) বায়ুমণ্ডলে কোন্ গ্যাসের পরিমাণ সবথেকে বেশি?
(১১) ট্রপোপজ কী?
(১২) বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ঝড়-বৃষ্টি হয়?
(১৩) সুমেরু ও কুমেরু প্রভা কি?
(১৪) বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত?
(১৫) বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর কোন্‌টি?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ

(১) পরিবেশ বিদ্যার মৌলিক ধারণা দাও।
(২) প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য কি?
(৩) শিলামণ্ডল সম্পর্কে যা জান লেখো।
(৪) জলচক্র কীভাবে সংগঠিত হয়?
(৫) রাসায়নিক গঠন অনুসারে বায়ুমণ্ডলের শ্রেণিবিভাগ করো।
(৬) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের গুরুত্ব আলোচনা করো।
(৭) আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে যা জান লেখো।
(৮) বায়ুমণ্ডলের ও বারি মণ্ডলের গুরুত্ব আলোচনা করো।

(গ) রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলি ঃ

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? এই পরিবেশের গঠনগত উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করো।
(২) উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে বায়ুমণ্ডলের শ্রেণিবিভাগ করো ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

একক 2 ❑ বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা

2.3 বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

2.4 বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ

2.5 বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

- **2.5.1** কার্যভিত্তিক উপাদান
- **2.5.2** সাংগঠনিক উপাদান

2.6 ট্রপিক লেভেল, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড

2.7 বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা

2.8 বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহ

- **2.8.1** তাপগতিবিদ্যার সূত্রদ্বয়
- **2.8.2** শক্তিপ্রবাহের পর্যায়
- **2.8.3** শক্তিপ্রবাহের মডেল
- **2.8.4** শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য

2.9 পুষ্টি চক্র

- **2.9.1** সংজ্ঞা
- **2.9.2** বিভিন্ন পুষ্টি চক্র
- **2.9.3** কার্বন চক্র
- **2.9.4** নাইট্রোজেন চক্র

2.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

2.1 প্রস্তাবনা

জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক চর্চার বিষয়কে বাস্তুবিদ্যা বা ecology বলে। জার্মান বিজ্ঞানী হাকেল (Haeckel) 1866 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Oekologie (গ্রিক 'Oikos' অর্থ বাসস্থান এবং 'Logos' অর্থ জ্ঞান) শব্দটি প্রয়োগ করেন। এই Oekologie থেকেই ecology শব্দটির উৎপত্তি। বাস্তুবিদ্যার সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, ''যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা বিদ্যা জীবের সঙ্গে ভৌত ও সজীব পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং এই ক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত বেঁচে থাকার উপাদান ও শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার সৃষ্টি করে তাকে বলে বাস্তুবিদ্যা''।

বাস্তুবিদ্যার মৌল কার্যকরী একককে বাস্তুতন্ত্র বলে। কোনো এক প্রকার জীবকে পরিবেষ্টনকারী এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী সজীব ও নির্জীব বস্তুসমূহকে জীবটির পরিবেশ বলে। একটি জীবের সঙ্গে তার পরিবেশের প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো আদানপ্রদানের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে আদানপ্রদানের দ্বারা কোনো একটি অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জীব সম্প্রদায়ই পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এই

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই বসবাসের উপযোগী যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠে তাকেই বাস্তুতন্ত্র বলে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর বায়োস্ফিয়ার বহুসংখ্যক বাস্তুতন্ত্রেরই সমষ্টিমাত্র। সুতরাং বলা যেতে পারে বাস্তুতন্ত্র হল নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিস্তৃত এমন এক মুক্ত ব্যবস্থা যাতে বিভিন্ন সজীব ও জড় উপাদান পারস্পরিক ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে বেঁচে থাকে। বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিক (যেমন- পুকুর, নদী, অরণ্য ইত্যাদি) বা কৃত্রিম (যেমন- মাছ ঘর, বাঁধ, বাগান, শহর ইত্যাদি) এই দুই প্রকার হতে পারে।

2.2 বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Ecosystem)

1935 খ্রিস্টাব্দে বাস্তুবিদ এ জি. ট্যান্সলি (A. G. Tansley) বাস্তুতন্ত্র বা eco-system শব্দটি প্রথম চয়ন করেন। তিনি 'eco' শব্দটিকে পরিবেশ অর্থে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী ওয়েবস্টার (Webster) 'System' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাঁর মতে, পুঞ্জীকৃত বস্তুসমূহের পারস্পরিক আন্তঃবিক্রিয়ার ফলে সংযোগ সাধিত হয়। বাস্তুবিদ ওডাম (Odum, 1971) বাস্তুবিদ্যার নিম্নরূপ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রদান করেন—

"যে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো বসতিস্থানে অবস্থিত জীবগোষ্ঠীগুলি একে অপরের সঙ্গে এবং ওই বসতি অঞ্চলের অজৈব পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে একটি সুস্থিত তন্ত্র গঠন করে, সেই সুস্থিত তন্ত্র গঠনের ক্রিয়া পদ্ধতিকে বাস্তুতন্ত্র বলে।"

2.3 বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ecosystem)

বিজ্ঞানী স্মিথ (Smith) 1974 খ্রিস্টাব্দে বাস্তুতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ করেন—

1. বাস্তুতন্ত্র হল বাস্তুবিদ্যার মূল কার্যকরী একক। বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই পুষ্টির চক্র আবর্তিত হয়।
2. বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব উপাদান নিয়ে গঠিত।
3. বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই শক্তির প্রবাহ সংঘটিত হয়। এই প্রবাহ বজায় রাখার জন্য উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
4. বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে শক্তির প্রবহন মাত্রা উৎপাদক সৃষ্ট শক্তির উপর নির্ভরশীল।
5. শক্তি প্রবহনের সময় প্রতিটি ট্রপিক স্তরে শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিটি স্তরে জীবভর নির্ধারণ করে।
6. প্রাথমিক ট্রপিক স্তর থেকে উচ্চতর ট্রপিক স্তরে অপেক্ষাকৃত জটিল তন্ত্র পরিলক্ষিত হয় এবং প্রতিটি স্তরে স্থিতিশক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়।
7. কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে নির্দিষ্ট প্রজাতির পপুলেশন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তারপর স্থিতাবস্থায় আসে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

2.4 বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Ecosystem)

পরিবেশের জীবিত এবং জড় উপাদানসমূহের আন্তঃক্রিয়ার ফলে একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। ফলে ওই বাস্তুতন্ত্র সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিবেশীয় পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞানী এলেনবার্গ (Ellenberg, 1973) সমগ্র পৃথিবীকে কয়েকটি বাস্তুতন্ত্রে বিন্যস্ত করেন। নিম্নে এই শ্রেণিবিভাজন আলোচনা করা হল—

(a) **বায়োস্ফিয়ার** — পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাস্তুতন্ত্র হল বায়োস্ফিয়ার। এই বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীবের সঙ্গে জড়বস্তুর আদানপ্রদান ঘটে। একই সঙ্গে শক্তির সরবরাহ এই অংশেই ঘটে থাকে।

(b) **মেগা বাস্তুতন্ত্র** — বায়োস্ফিয়ারের পরবর্তী অন্যতম বৃহৎ বাস্তুতন্ত্রকে মেগা বাস্তুতন্ত্র বলে। যেমন— সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র, হ্রদের বাস্তুতন্ত্র।

(c) **লিমনিক বাস্তুতন্ত্র** — স্বাদু জলের বাস্তুতন্ত্র হল এই প্রকার বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ।

(d) **সেমি-টেরিস্ট্রিয়াল বাস্তুতন্ত্র** — সিক্ত মাটি এবং সিক্ত বায়ু এই প্রকার বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(e) **টেরিস্ট্রিয়াল বাস্তুতন্ত্র** — শুষ্ক মাটি এবং শুষ্ক বায়ু এই প্রকার বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত।

(f) **আরবান - ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাস্তুতন্ত্র** — মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র, যেমন- চাষযোগ্য জমি, শহর এই প্রকার বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত।

(g) **ম্যাক্রো বাস্তুতন্ত্র** — উপরিউক্ত বাস্তুতন্ত্রগুলির থেকে ছোটো বাস্তুতন্ত্রকে ম্যাক্রো বাস্তুতন্ত্র বলে। যেমন— বনভূমির বাস্তুতন্ত্র।

(h) **মেসো বাস্তুতন্ত্র** — মেসো বাস্তুতন্ত্রকে বাস্তুতন্ত্রের মৌলিক একক বলা হয়। এই বাস্তুতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মাইক্রো বাস্তুতন্ত্র ঃ কতকগুলি নির্দিষ্ট উপাদান নিয়ে এই বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়। যেমন— নীচু জমি, পাহাড় বা উপত্যকা ইত্যাদি।

ন্যানো বাস্তুতন্ত্র ঃ এই বাস্তুতন্ত্রটি একটি বৃহৎ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত। এই প্রকার বাস্তুতন্ত্রের সর্বদাই একটি স্বাধীন সত্তা বর্তমান।

2.5 বাস্তুতন্ত্রের উপাদান (Components of Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ওডাম (1966) বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করেন। এরা যথাক্রমে—

১। কার্যভিত্তিক উপাদান

২। সাংগঠনিক উপাদান

আবার গঠনগতভাবে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত উপায়ে ভাগ করা যায়—

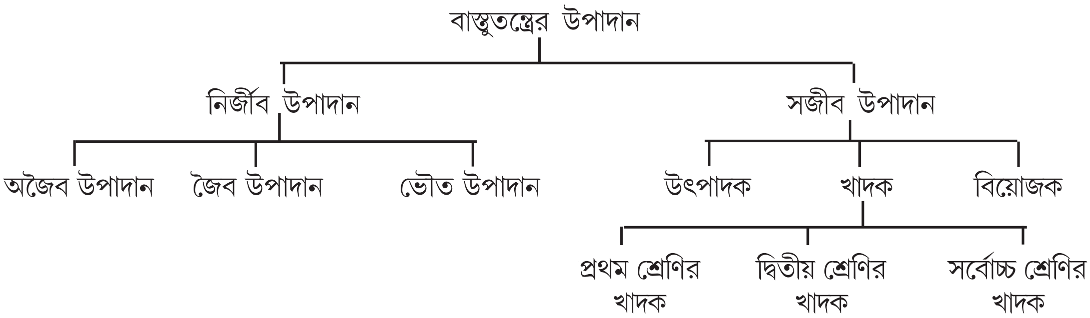

2.5.1 কার্যভিত্তিক উপাদান

স্বভোজী উপাদান ঃ যেসকল জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপন্ন করতে পারে তাদের স্বভোজী উপাদান বলে। কয়েকটি প্রাণি (যেমন - ইউগ্লিনা) ছাড়া ক্লোরোফিল যুক্ত সকল উদ্ভিদেরই এই ক্ষমতা বর্তমান। ক্লোরোফিল বায়ু

থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্রহণ করে এবং সূর্যালোক ও মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের সাহায্যে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জটিল শর্করা খাদ্য তৈরি করে।

$$6CO_2 + 12H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O + \text{তাপশক্তি।}$$

গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) ছাড়াও প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহও সংশ্লেষিত হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর সকল সবুজ উদ্ভিদই বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক।

পরভোজী উপাদান ঃ যে সকল জীব নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, পরন্তু খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল তাদের পরভোজী বলে। কিছু ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদ এবং সকল প্রাণিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল।

2.5.2 সাংগঠনিক উপাদান

নির্জীব উপাদান ঃ পরিবেশের সকল জড় উপাদান এর অন্তর্গত। এই উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) অজৈব উপাদান ঃ জল, মাটি, বিভিন্ন খনিজ লবণ, গ্যাসীয় পদার্থ বাস্তুতন্ত্রের অজৈব উপাদান। সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুতিতে এই সকল উপাদানসমূহকে ব্যবহার করে।

(ii) জৈব উপাদান ঃ মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের বিভিন্ন রকম জৈববস্তুর পচনের ফলে উদ্ভুত পদার্থসমূহ, যেমন— প্রোটিন, ফ্যাট, ইউরিয়া, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি পরিবেশের জৈব উপাদানের অন্তর্গত।

(iii) ভৌত উপাদান ঃ সৌরশক্তি, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আলো, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিবেশের ভৌত উপাদান। যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজনীয় শক্তির একমাত্র উৎস সূর্যালোক।

সজীব উপাদান ঃ বাস্তুতন্ত্রের সকল জীবই এই উপাদানের অন্তর্গত। এই উপাদানসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

উৎপাদক ঃ যে সকল ক্লোরোফিলযুক্ত জীব সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তার নিজের দেহে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে তাদের উৎপাদক বলে। যেমন— ক্লোরোফিলযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ। সকল প্রাণিই জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল।

খাদক ঃ যে সকল জীব সালোকসংশ্লেষে অক্ষম এবং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের খাদক বলে। প্রধানত তিন শ্রেণির খাদক বাস্তুতন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

(ক) প্রথম শ্রেণির খাদক ঃ যে সকল প্রাণি তাদের জীবন ধারণের জন্য সরাসরি উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের প্রথম শ্রেণির খাদক বলে। যেমন— শামুক, তৃণভোজী মাছ, গোরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক ঃ যে সকল প্রাণি খাদ্যের জন্য প্রথম শ্রেণির খাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের গৌণ খাদক বা দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক বলে। যেমন— নেকড়ে, বিভিন্ন পতঙ্গভুক পাখি ইত্যাদি।

(গ) সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক ঃ যে সকল প্রাণি তাদের খাদ্যের জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকের উপর নির্ভরশীল তাদের সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক বলে। যেমন— বাঘ, সিংহ, মানুষ ইত্যাদি।

বিয়োজক ঃ যে সকল অণুজীব মৃত উৎপাদক এবং খাদকের দেহাবশেষকে বিয়োজিত করে বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদকের পুনঃব্যবহারযোগ্য জৈব বস্তুতে রূপান্তরিত করে তাদের বিয়োজক বলে। যেমন— বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও

ছত্রাক। বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো—

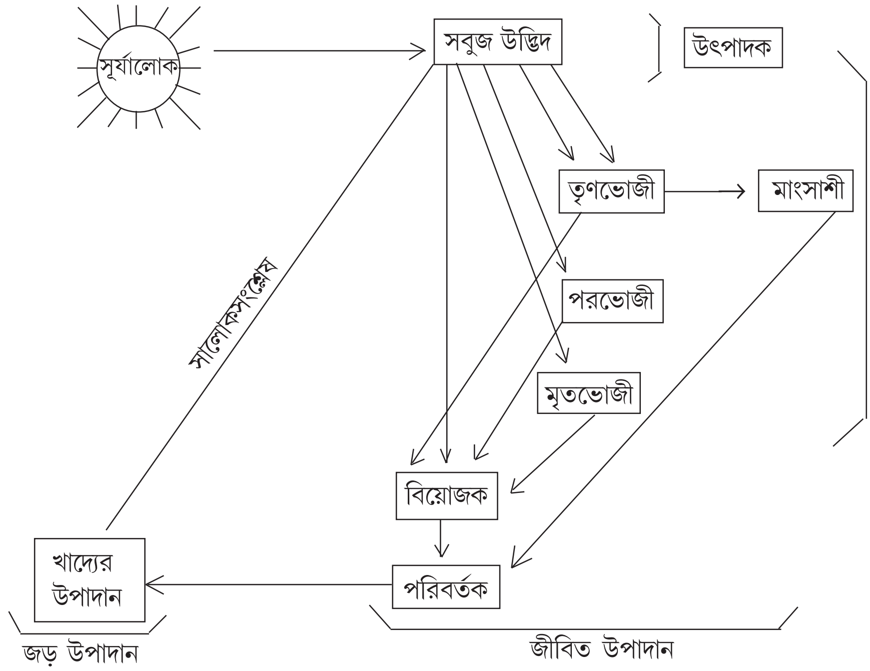

2.6 ট্রপিক লেভেল, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক ও খাদ্য পিরামিড (Trophic level, Food chain, Food web and Food Pyramid

উদ্ভিদ ও প্রাণির পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানতে হলে পুষ্টি স্তর, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য জালক, খাদ্য পিরামিড ও ইকোসিস্টেমের শক্তিপ্রবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন।

ট্রপিক স্তর ঃ ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত কোনো সদস্য জীব খাদ্যশৃঙ্খলের যে খাদ্যস্তরে অবস্থান করে সেই খাদ্যস্তরকে ওই খাদ্যশৃঙ্খলের 'সংরক্ষিত তল' বা 'ট্রপিক লেভেল' বা 'পুষ্টি স্তর' বলে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলে দুই বা ততোধিক ট্রপিক লেভেল থাকতে পারে। উৎপাদক (সবুজ উদ্ভিদ) খাদ্যশৃঙ্খলের সূচনা করে, তাই এই স্তরকে ''প্রথম ট্রপিক লেভেল'' বলা হয়।

খাদ্যশৃঙ্খল ঃ খাদ্য খাদকের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট প্রণালীতে খাদ্যশক্তি উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রমপর্যায়ে আরও উন্নত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। শক্তি প্রবাহের এই ক্রমিক পর্যায়কে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। বিজ্ঞানী ওডামের মতে, ''উৎপাদক কর্তৃক আবদ্ধ শক্তি পরপর বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সর্বোচ্চ খাদ্যস্তরে পৌঁছানোর শৃঙ্খলকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে।'' উদাহরণস্বরূপ, একটি মিষ্টি জলের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তিপ্রবাহ নীচে দেখানো হল।

(উৎপাদক) (প্রথম শ্রেণির খাদক) (দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক) (তৃতীয় শ্রেণির খাদক) (চতুর্থ শ্রেণির খাদক)
উদ্ভিদ, শৈবাল ——→ পতঙ্গ ——————→ ব্যাঙ —————→ মাছ ——————→ মানুষ
(ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন)

বাস্তুতন্ত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত তিন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন—

(১) **শিকারি খাদ্যশৃঙ্খল** (Predator food chain) ঃ এই শৃঙ্খল উৎপাদক থেকে শুরু হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়গুলিতে জীবের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায়।

উদাহরণ ঃ—

উদ্ভিদ —→ কীটপতঙ্গ —→ ব্যাঙ —→ বাজপাখি

(২) **পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল** (Parasitic food chain) ঃ এই শৃঙ্খল বৃহৎ জীব থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমপর্যায়ে ক্ষুদ্র পরজীবীতে শেষ হয়।

উদাহরণ ঃ—

মানুষ —→ কৃমি —→ আদ্যপ্রাণী

(৩) **মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল** (Saprophytic food chain) ঃ এই শৃঙ্খল মৃতজীবী থেকে আরম্ভ হয়ে ব্যাকটেরিয়াতে শেষ হয়।

উদাহরণ ঃ—

মৃত উদ্ভিদ —→ ছত্রাক —→ ব্যাকটেরিয়া

খাদ্য জালক ঃ

বাস্তুতন্ত্রের শক্তি ও বস্তু অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এইভাবে সংযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খলগুলিকে খাদ্য জালক বলে। নিম্নে প্রেইরি তৃণভূমির একটি খাদ্য জালক চিত্রসহ দেখানো হল।

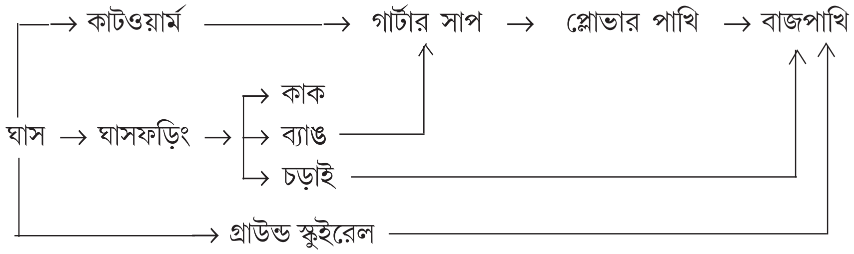

চিত্র ঃ প্রেইরি তৃণভূমির খাদ্য জালক

খাদ্য পিরামিড ঃ একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিতন্ত্রের সামগ্রিক গঠনকে অনুক্রমিকভাবে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয় তাকে খাদ্য পিরামিড বলে। ব্রিটিশ ইকোলজিস্ট চার্লস এলটন (1927) সর্বপ্রথম এই পিরামিড সম্পর্কে ধারণা দেন.

(১) সংখ্যা পিরামিড

(২) শক্তির পিরামিড

(৩) জীবভর পিরামিড

(1) সংখ্যা পিরামিড ঃ

উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এরূপে সৃষ্ট পিরামিডকে সংখ্যা পিরামিড বলে।

নীচে একটি সংখ্যার পিরামিড দেখানো হল—

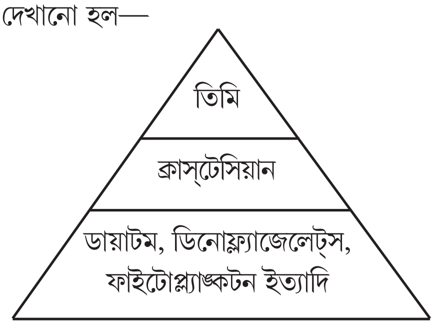

এখানে ডায়াটম, ডিনোফ্ল্যাজেলেট্স ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা অনেক বেশি (উৎপাদক)। প্রথম শ্রেণির খাদক যেমন, ক্রাস্টেসিয়ান এর সংখ্যা উৎপাদকের সংখ্যা থেকে কম। আবার দ্বিতীয় শ্রেণির খাদকের (তিমি) সংখ্যা সবথেকে কম।

(2) শক্তির পিরামিড ঃ

একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি খাদ্যস্তরে (উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক পর্যন্ত) সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যে পিরামিড সৃষ্টি করে তাকে শক্তির পিরামিড বলে।

একটি শক্তির পিরামিডের চিত্র দেখানো হল—

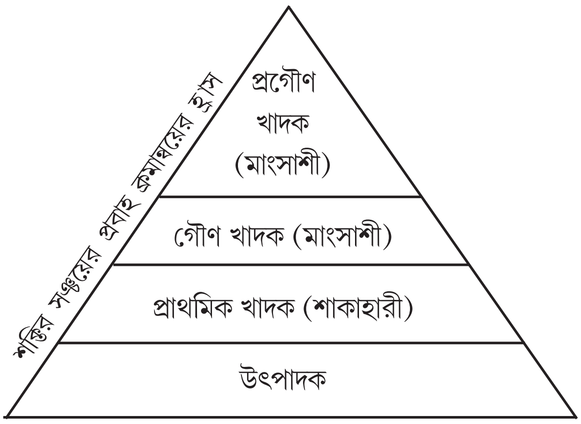

(3) জীবভর পিরামিড ঃ

একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রত্যেক স্তরের সজীব বস্তুর শুষ্ক ওজনকে জীবভর বলে। দেখা যায় উৎপাদকের জীবভর থেকে প্রাথমিক স্তরের খাদকের জীবভর কম হয়, আবার প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় স্তর, দ্বিতীয় স্তর থেকে তৃতীয় স্তরে জীবভর ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এইভাবে সৃষ্ট পিরামিডকে জীবভরের পিরামিড বলে।

নিম্নে একটি জীবভরের পিরামিড দেখানো হল।

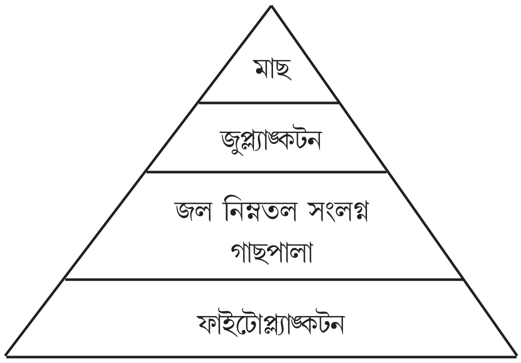

2.7 বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা (Productivity of Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্রের প্রথম ট্রপিক স্তরটি উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদ। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এবং পত্রস্থ ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও জলের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় শর্করা খাদ্য উৎপাদন করে। ফলে বলা যেতে পারে সূর্য রশ্মি শক্তি হিসাবে জীবিত কলায় আত্তীভূত হয় বা শর্করা খাদ্যের মধ্যে স্থিত হয়। যেহেতু উদ্ভিদ শর্করা গঠনের মাধ্যমে সকল শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসাবে সঞ্চিত করে ফলে উৎপন্ন শর্করার পরিমাণ জানা থাকলে কী পরিমাণ শক্তির আত্তীকরণ হয়েছে তা জানা সম্ভব। একেই **সামগ্রিক প্রাথমিক উৎপাদন** বা Gross Primary Productivity বলে।

এই উৎপাদিত শক্তির বহুলাংশ উদ্ভিদের শ্বসনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের সকল জৈব পদার্থের পরিমাপের সঙ্গে সঙ্গে **জীবভরের** (Biomass) ওজন পাওয়া যায়। আবার প্রকৃত উৎপাদন বা Net Production হল জীবভর ও শ্বসনে ব্যবহৃত শক্তির বিয়োগফল। গাণিতিক ভাষায়—

$Pg - R = Pn$;   যেখানে Pg = সামগ্রিক উৎপাদন,

বা $Pg = Pn + R$; Pn = প্রকৃত উৎপাদন

R = শ্বসনে নিমিত্ত শক্তির ব্যয়।

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে স্থিতিশক্তির বৃদ্ধিকেই প্রকৃত উৎপাদন এবং যে-কোনো সময়ের সামগ্রিক শক্তির উৎপাদনকে জীবভর বলে। এই গাণিতিক সূত্রে যদি $Pg = R$ হয় তবে শক্তির হারের তারতম্য হয় না। আবার $Pg > R$ হলে জীবভর হ্রাস পায়। একইভাবে $Pg < R$ হলে জীবভরের ওজন বৃদ্ধি পায়।

2.8 বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ (Energy flow in Ecosystem)

একটি বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত সজীব এবং নির্জীব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। সকল সজীব বস্তু সৌরশক্তি কে কাজে লাগায়। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং বিপাকীয় কার্যে এই রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক অথবা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার একই বাস্তুতন্ত্রে বর্তমান খাদ্য এবং খাদক পরস্পরের সঙ্গে খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করে। উৎপাদক সৃষ্ট শক্তি খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে নিম্নতম খাদ্যস্তর উচ্চতর খাদ্যস্তরের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে শক্তিপ্রবাহের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি, "শক্তির অবস্থান্তর ও খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ট্রপিক স্তরের জীবের মধ্যে দিয়ে এর ধারাবাহিক পরিচালনকে শক্তিপ্রবাহ বলে।"

বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবহন সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করতে হলে তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

2.8.1 তাপ গতিবিদ্যার সূত্রদ্বয়

প্রথম সূত্র ঃ শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না। শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় শক্তির পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ যখন শক্তির স্থানান্তর বা অবস্থান্তর ঘটে তখন শক্তির কিছু অংশ এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে এটি পরবর্তী পর্যায়ে প্রবাহিত হতে পারে না।

একটি বাস্তুতন্ত্রে সৌরশক্তি থেকে উদ্ভিদের দেহে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে অনুসরণ করে। আবার বিভিন্ন খাদক স্তরে রূপান্তরিত হওয়ার সময় যে শক্তি হ্রাস পায়, তা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

2.8.2 শক্তিপ্রবাহের পর্যায়

বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত সৌরশক্তি উৎপাদক থেকে তিনটি পর্যায়ে খাদকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। যেমন—

(i) **শক্তি অর্জন ঃ** বাস্তুতন্ত্রে শক্তির মূল উৎস হল সূর্যালোক। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি গ্রহণ করে তাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই শক্তি উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ থাকে। সেজন্য এই পর্যায়কে শক্তি অর্জন পর্যায় বলে। সূর্য থেকে আপতিত সৌরশক্তির মাত্র 0.2 শতাংশ উৎপাদক সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত খাদ্যে আবদ্ধ করতে পারে।

(ii) **শক্তির ব্যবহার ঃ** উৎপাদকের সংশ্লেষিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি আবদ্ধ হয় তার কিছু অংশ তারা নিজের শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহার করে। কিছু অংশ অপাচ্য ও রেচন পদার্থরূপে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ, প্রাণিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং বিভিন্ন জৈবনিক কাজগুলি সম্পন্ন করে।

(iii) **শক্তি স্থানান্তকরণ ঃ** উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথম শ্রেণির খাদকের এবং পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় শ্রেণির ও তৃতীয় শ্রেণির খাদকের দেহে প্রবাহিত বা স্থানান্তরিত হয়। সর্বোপরি বিয়োজক মৃত খাদক সমূহকে বিশ্লিষ্ট করে পুনরায় পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

2.8.3 শক্তিপ্রবাহের মডেল

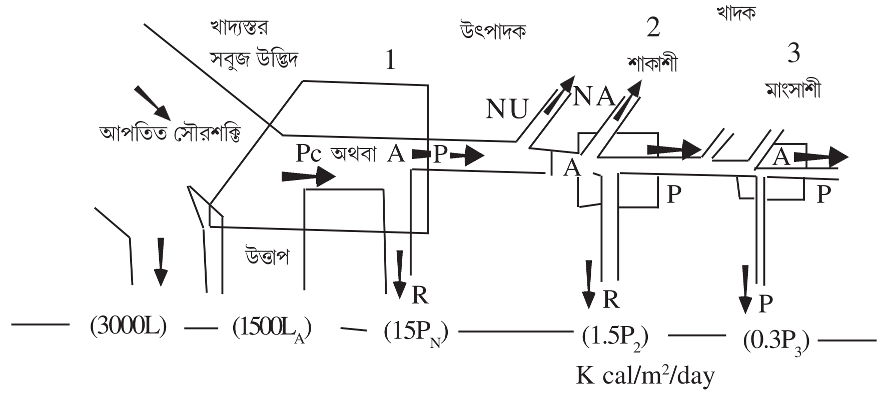

চিত্র ঃ তিনটি খাদ্যস্তরসহ সরলীকৃত একমুখী শক্তি প্রবহন মডেল।
LA - আপতিত রশ্মি, আত্তীকরণ শক্তি, PG - সম্ভাব্য উৎপাদন,
PN - প্রকৃত উৎপাদন, NU-অব্যবহৃত শক্তি, NA - অনাত্তীকৃতি শক্তি

উপরের চিত্রে তিনটি বাক্স (1, 2 এবং 3) তিনটি পর্যায়ক্রমিক খাদ্যস্তরকে নির্দেশ করে এবং পাইপ লাইনটি শক্তি

প্রবহনের খাদ্যস্তরে প্রবেশ এবং খাদ্যস্তর থেকে নিষ্ক্রমণকে নির্দেশ করে। প্রতিটি খাদ্যস্তরের জীবসমূহ তার পূর্ববর্তী খাদ্যস্তর থেকে শক্তি গ্রহণ করে এবং এই গৃহীত শক্তির বেশিরভাগই শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহার করে। বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি অব্যবহৃত থাকে এবং বাকি পরিমাণ নিজ দেহে আত্তীকরণ হয়। অর্থাৎ, শক্তির অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রবহনে শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়, যা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে সমর্থন করে। উপরিঅঙ্কিত মডেল অনুসারে 3000 কিলো ক্যালোরি সৌরশক্তি সবুজ উদ্ভিদের উপর আপতিত হয় কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ মাত্র 1500 কিলো ক্যালোরি শক্তি শোষণ করে, যার মধ্যে মাত্র 1.5 কিলো ক্যালোরি প্রথম শ্রেণির খাদকে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং প্রকৃত উৎপাদন 1.5 কিলো ক্যালোরি এবং শেষ খাদ্যস্তরে সামগ্রিক শক্তি তার মাত্র 10%। অর্থাৎ প্রতিটি খাদ্যস্তরে শক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমিকভাবে হ্রাস পায়।

2.8.4 শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য

একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবহনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

- বাস্তুতন্ত্রের সমগ্র শক্তির উৎস হল সৌরশক্তি।
- শক্তিপ্রবাহ তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে মেনে চলে।
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী।
- উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদক পর্যন্ত প্রতিটি খাদ্যস্তরে শক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়।

2.9. পুষ্টি চক্র (Nutrient Cycle)

পদার্থের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী কোনো পদার্থকেই সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিস্থ কার্বন এবং নাইট্রোজেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নবার ব্যবহৃত হয়। বহিঃজগত থেকে বিশাল পরিমাণ পদার্থ কখনই পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, বা পৃথিবী থেকে ওই পদার্থ বহিঃজগতে গমন করে না। কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার প্রভৃতি প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মৌলিক উপাদান। এই উপাদানসমূহ সর্বদাই চক্রাকারে প্রকৃতিস্থ বিভিন্ন পদার্থের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়।

2.9.1 সংজ্ঞা

প্রোটোপ্লাজমের প্রধানতম রাসায়নিক উপাদানসমূহ জীবমণ্ডলে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত পথে পরিবেশ থেকে জীবে এবং জীব থেকে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের এই চক্রগুলিকে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র (Bio-geochemical cycle) বলে। জীবের এই সকল উপাদান এবং যৌগের চক্রকে পুষ্টি চক্রও (Nutrient cycle) বলে।

2.9.2 বিভিন্ন পুষ্টি চক্র

প্রকৃতির রাসায়নিক চক্রগুলির মধ্যে কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র, ফসফরাস চক্র, সালফার চক্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কার্বন চক্র এবং নাইট্রোজেন চক্র আলোচনা করা হল।

2.9.2.1 কার্বন চক্র

বিভিন্ন রাসায়নিক পুষ্টি চক্রের মধ্যে কার্বন চক্রই সর্বাধিক সরল। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের প্রধানতম উপাদান

হল কার্বন। প্রকৃতির কার্বনের বহুলাংশই সমুদ্রে বাই-কার্বনেট হিসাবে সঞ্চিত থাকলেও এই কার্বনের ভাণ্ডারই বায়ুর কার্বনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বোপরি কার্বন চক্রটি জীব ও বায়ুস্থিত কার্বনের মধ্যেই আবর্তিত হয়।

একটি বাস্তুতন্ত্রে কার্বন, কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে উৎপাদক (সবুজ উদ্ভিদ) দ্বারা শোষিত হয়। অতঃপর উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক, প্রথম স্তরের খাদক থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ স্তরের খাদকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সবশেষে এই সকল খাদক বিয়োজক দ্বারা বিয়োজিত হয়ে কার্বনরূপে পুনরায় বায়ুতে ফিরে যায়। অর্থাৎ, বায়ুস্থিত কার্বন - উৎপাদক - খাদক - বিয়োজক - বায়ু এইভাবে চক্রটি সম্পন্ন হয়।

উৎপাদক ছাড়াও সমুদ্রের জল, প্রস্তরখণ্ড, চুনাপাথর, শিলা প্রভৃতি বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট গঠন করে। এ ছাড়াও কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের দহন ও ভূনিম্নস্থ কয়েক প্রকার জীবাণুর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আগ্নেয়গিরি ও উষ্ম প্রস্রবণ থেকেও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের জলজ পর্যায় অধঃক্ষেপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি সর্বদা বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য কার্বনিক অ্যাসিড ওই বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় H^+ এবং CH_3^- আয়নে ভেঙে যায়। বিক্রিয়ার সমীকরণটি নিম্নরূপ—

$$CO_2 + H_2O \quad H_2CO_3 \quad H^+ + HCO_3^-$$

(কার্বনিক অ্যাসিড)

$$HCO_3^- \quad 2H^+ + CO_3^-$$

(বাইকার্বনেট) (কার্বনেট)

নিম্নের চিত্রে একটি বাস্তুতন্ত্রের কার্বন চক্র দেখানো হল—

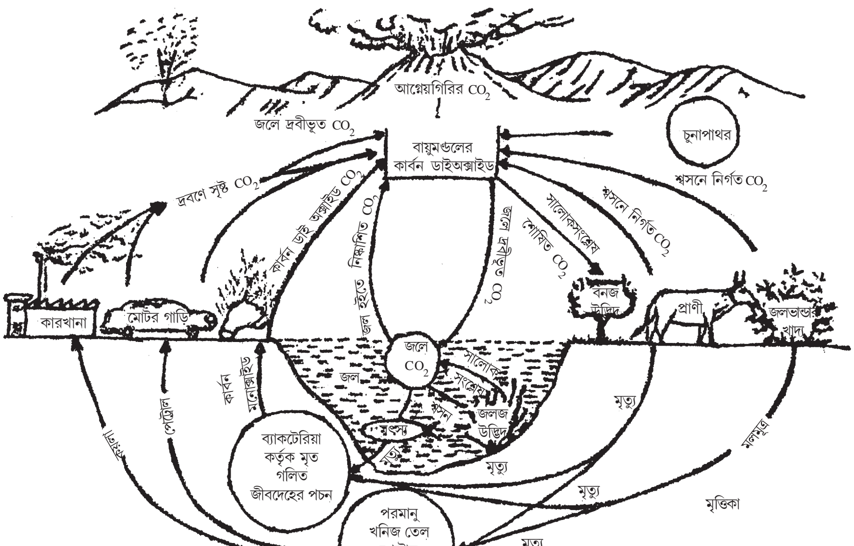

চিত্র ঃ প্রকৃতিতে কার্বন চক্র

2.9.2.2 নাইট্রোজেন চক্র

জীবদেহের অন্যতম প্রধান সংগঠক বস্তুটি হল প্রোটিন। এই প্রোটিন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ঘটিত পদার্থ। কাজেই বলা যেতে পারে নাইট্রোজেন জীবদেহের অন্যতম প্রধান উপাদান। বায়ুমণ্ডলে শতকরা 78 ভাগ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদরা মাটিতে অবস্থিত দ্রব্যে নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে অথবা শিম্বজাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদ তাদের মূলে অবস্থিত কতগুলি মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজনে গ্রহণ করে।

প্রকৃতিস্থ নাইট্রোজেন পারমাণবিক অবস্থায় অ্যামোনিয়ায় আবদ্ধ হয়। অতঃপর এই অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেট বৃষ্টির জলের মাধ্যমে মাটিতে নেমে আসে এবং সেখানে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত অ্যামোনিয়া উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ দ্বারা অ্যামোনিয়া আয়ন (NH_4^-) হিসাবে শোষিত হতে পারে। অন্য পদ্ধতিতে কিছু ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং নীলাভ সবুজ শৈবাল বায়ুস্থিত নাইট্রোজেনকে নিঃসরিত করে এবং হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

মৃত্তিকাস্থিত অ্যামোনিয়া জল ও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এলে অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণে পরিণত হয় বা এই অ্যামোনিয়া মৃত্তিকাস্থিত কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার (নাইট্রোসোমোনাস) প্রভাবে জারিত হয়ে নাইট্রেটে পরিণত হয়।

$$2NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{\text{নাইট্রোসোমোনাস}} \underset{\text{(নাইট্রাইট)}}{2NO_2^-} + 2H_2O + 2H^+$$

অতঃপর এই নাইট্রাইট নাইট্রোব্যাক্টর নামক অপর একটি ব্যাকটেরিয়া প্রভাবে নাইট্রেটে পরিণত হয়—

$$2NO_3^- + O_2 \xrightarrow{\text{নাইট্রোব্যাক্টর}} \underset{\text{(নাইট্রেট)}}{2NO_3^-}$$

এই দুইটি বিক্রিয়াই অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে এবং এই ঘটনাকে নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) বলে। স্বভোজী উদ্ভিদসমূহ এই নাইট্রেট গ্রহণ করে এবং খাদ্যশৃঙ্খলের সূচনা হয়। আবার যে পদ্ধতিতে নাইট্রেট বিশ্লিষ্ট হয় তাকে ডি-নাইট্রিফিকেশন (Denitrification) বলে। রাইজোবিয়াম নামক একটি ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেটকে বিশ্লিষ্ট করে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে অ্যামোনিয়া ও আণবিক নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে।

শিম্বজাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়াম নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রত্যক্ষভাবে মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে নাইট্রেটে পরিণত করে উদ্ভিদকে সরবরাহ করে থাকে। সাধারণত নাইট্রোজেন নাইট্রেটে পরিবর্তিত হবার পর উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয়। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মৃত্যুর পর তাদের দেহস্থিত প্রোটিন মাটিতে মিশে যায়। আবার প্রাণীর মলমূত্র বিশ্লেষিত হয়ে অ্যামোনিয়া গঠিত হয়। এই অ্যামোনিয়া মৃত্তিকায় অবস্থিত নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার (নাইট্রোসোমোনাস ও নাইট্রোকক্কাস) সাহায্যে আবার নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। এই নাইট্রেটের কিছুটা উদ্ভিদ আত্মসাৎ করে এবং কিয়দংশ ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া (থায়োব্যাসিলাস, মাইক্রোকক্কাস) দ্বারা মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির ফলে প্রকৃতিস্থ নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে এবং সর্বোপরি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে পুনরায় মাটিতে এবং মাটি থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এই স্বতঃনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

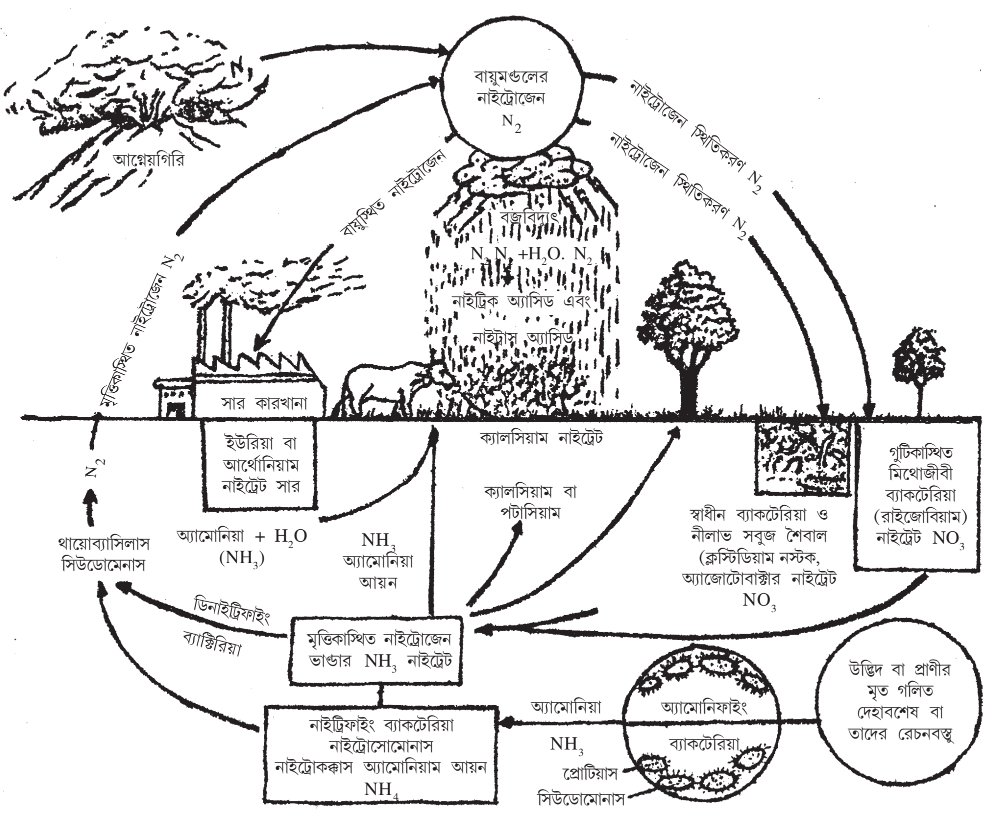

চিত্র ঃ প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র

2.10. সর্বশেষ প্রশ্নাবলী (Terminal Questions)

[1] বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? এই শব্দটি কে প্রণয়ন করেন?

[2] বাস্তুতন্ত্রে বিয়োজকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

[3] উদাহরণসহ প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণির খাদকের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

[4] ম্যাক্রো ও মেসো বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে?

[5] বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহ তাপগতিবিদ্যার সূত্রদ্বয়কে মেনে চলে— আলোচনা করুন।

[6] বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

[7] সামগ্রিক প্রাথমিক উৎপাদন ও প্রকৃত উৎপাদনের সংজ্ঞা লিখুন।

[8] পুষ্টি চক্র কাকে বলে? যেকোন একটি পুষ্টি চক্রের বর্ণনা দিন।

একক 3 ❑ পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution)

3.1 পরিবেশ দূষণ ও দূষণজনিত অবক্ষয়

3.2 বায়ুদূষণ

- **3.2.1** বায়ুদূষণের প্রকারভেদ
- **3.2.2** বায়ুদূষণের কারণ
- **3.2.3** বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক ফলাফল
- **3.2.4** বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

3.3 জলদূষণ

- **3.3.1** জলদূষণের সংজ্ঞা ও উৎস
- **3.3.2** বিশুদ্ধ জলের ধর্ম ও গুণাবলি
- **3.3.3** জলদূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগব্যাধি
- **3.3.4** জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণ

3.4 ভূমিদূষণ

- **3.4.1** মৃত্তিকা
- **3.4.2** মৃত্তিকা অবনমণের কারণ ও তার প্রতিকার
- **3.4.3** বর্জ্য পদার্থজনিত দূষণ

3.5 শব্দদূষণ

- **3.5.1** শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস
- **3.5.2** শব্দের প্রাবল্যমাত্রা
- **3.5.3** জনস্বাস্থ্যের উপর শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব
- **3.5.4** শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

3.6 অনুশীলনী

3.1 পরিবেশ দূষণ ও দূষণজনিত অবক্ষয়

পরিবেশ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি বিভিন্ন সজীব ও জড় উপাদানের সমন্বয় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় গঠিত এক সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি, যা জীবনের উৎস ও বৃদ্ধির সহায়ক। প্রকৃতির নিজস্ব গতিময়তার কারণে পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ পরিবেশের উপাদানগুলির আনুপাতিক হার, অবস্থান, বিশুদ্ধতা বা বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক— কিছুই স্থির নয়। এই পরিবর্তনকে আমরা তখনই দূষণ বলে থাকি, যদি পরিবর্তনটি জীবনের অস্তিত্ব বা বৃদ্ধির পক্ষে কোনও ভাবে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, পরিবেশ দূষণ হলো পরিবেশের কোনও নেতিবাচক পরিবর্তন যা জীব ও জড় উপাদানগুলির স্বভাবিক সাম্য বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা গঠিত

সামগ্রিক প্রকৃতির গুণগত মানের অবনতি ঘটায়। এই সামগ্রিক অবনতিকে আমরা ব্যাখ্যা করি পরিবেশের অবক্ষয়রূপে।

সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে ক্রমপরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে পৃথিবীর জড় ও জীবজগতের বিবর্তন ঘটে এসেছে। জীবজগতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি তার বিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবলুপ্তি তার সবই প্রকৃতির সূত্র মেনে হয়ে এসেছে। বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী এবং জীবজড়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের কাজটিও প্রকৃতিই করেছে। প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের বাস্তুতন্ত্রের নিয়মভঙ্গ ও তার দ্বারা সংগঠিত প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারক হলো মানুষের অপরিণামদর্শী স্বার্থচিন্তা যার জন্য আজ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি ক্ষতিগ্রস্থ এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর মতো এর ফলভোগ করতে হবে মানবজাতিকেও। পৃথিবীর জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ-প্রাণীর পারস্পরিক ভারসাম্যে ক্ষতি হয়। মানুষ নিজের অর্থনৈতিক লাভ সামাজিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের যে ব্যাপক ব্যবহার করতে শুরু করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশরক্ষা সংক্রান্ত সতর্কতা কখনই নেওয়া হয়নি। অতি দ্রুত হারে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে চাহিদা সৃষ্টি হয় বসতি, চাষআবাদের স্থান ইত্যাদির। এই সকল প্রয়োজনে অরণ্যের বিনাশ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনজনিত কারণে জল, মাটি, বায়ুর স্বাভাবিক গুণগত মানের অবক্ষয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে শখ বা লাভের জন্য যথেচ্ছ পরিমাণ প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করার ফলে আজ পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্ব সত্যই বিপন্ন। পরিবেশের সকল সম্পদ যেমন ভৌত (বস্তুগত) উপাদান, আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডল এবং বাস্তুতন্ত্রের অরণ্য ও জলজ প্রাণ সম্পদ ইত্যাদির যথাযথ বিশুদ্ধিকরণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মানুষের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা একইসাথে পরিবেশের উপাদান এবং উপাদানের নিয়ন্ত্রক।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা পরিবেশের দুটি প্রধান উপাদান বায়ু ও জলের দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

3.2 বায়ুদূষণ

বায়ু পরিবেশের এমন এক উপাদান যার বিশুদ্ধতা জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় অপরিহার্য। আমাদের পরিবেশের প্রধানতম উপাদান বায়ু যার মধ্যে থেকে শ্বাসগ্রহণ করে আমরা প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করি। বায়ু উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্বিশেষে সকল জীবের জীবনের উৎস। বায়বিক উপাদানের বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্ট পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা বাস্তুতন্ত্রের কাঠামো গড়ে ওঠে। কোন স্থানের বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের কোন প্রকার পরিবর্তন তাই সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। এই অংশে আমরা বায়ুদূষণের সংজ্ঞা, কারণ, ফলাফল ও সম্ভাব্য প্রতিকার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

সংজ্ঞা ঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের অনুপ্রবেশ বা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানগুলির পারস্পরিক অনুপাতের পরিবর্তন যা প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবনমাত্রায় কোনও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে আমরা বায়ুদূষণ বলে থাকি।

বায়ু জীবজগতকে ঘিরে থাকা এক মিশ্র, চলমান ও সদা পরিবর্তনশীল গ্যাসীয় পদার্থ। বায়ুদূষণ তাই সর্বদা সামগ্রিক অবক্ষয়ের সূচক যা পরিবেশের অন্যসকল উপাদানগুলিকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে এবং দ্রুত একস্থান হতে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এটি এক আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমস্যারূপে চিহ্নিত হয়েছে। বায়ুদূষণের ফলে ওজোন স্তরে ক্ষয় সৃষ্টি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও গ্রীনহাউস এফেক্ট মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে এক অশনিসংকেত হয়ে দেখা দিচ্ছে। বায়ুদূষণের নানা প্রভাবের ফলে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন অসুখ সংক্রামণ ও তৎজনিত মৃত্যুর হার আক্ষরিক অর্থেই উদ্বেগজনক।

বায়ুদূষণ প্রধানতঃ বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরগুলি অর্থাৎ সমমণ্ডলের (Homosphere) স্তরগুলিতে আবদ্ধ। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন জীবজন্তুকে ঘিরে থাকা ক্ষুব্ধমণ্ডলে (Troposphere) বায়ুদূষণে প্রভাব সর্বাত্মক এবং স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধমন্ডল দূষণের ফল জীবকূলের অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক।

3.2.1 বায়ুদূষণের প্রকারভেদ ঃ

দূষক পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বায়ু দূষণকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা সম্ভব।

(১) গ্যাসীয় দূষণ ঃ বায়ুতে কোনও বিষাক্ত বা ক্ষতিকর গ্যাসের মিশে যাওয়ার ফলে এই প্রকার বায়ুদূষণ ঘটে। কয়েকটি প্রধান দূষক গ্যাস হলো কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (N_2O, NO, NO_2 ইত্যাদি) এছাড়া বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যকিছু বিষাক্ত গ্যাস যেমন অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড, ক্লোরিন ইত্যাদি কোনও ভাবে বায়ুতে মিশে পরিবেশকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার কোনও কারণে বায়ুর গ্যাসীয় উপাদানগুলির স্বাভাবিক অনুপাতে পরিবর্তন ঘটার ফলে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসটি বায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এটি প্রাথমিক খাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের খাদ্যউৎপাদনের কাজে একটি অন্যতম প্রধান পদার্থ রূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রাণী বিশেষতঃ মানুষের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভিদ প্রাণীর সংখ্যার স্বাভাবিক অনুপাত ব্যহত হয়েছে এবং অত্যাধিক প্রাণীর শ্বাসকার্যের ফলে নির্গত এবং কয়লাজাত পদার্থ দহনের ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় উত্তাপ নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পৃথিবীর আবহাওয়ায় একটি মারাত্মক দূষণ এবং সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানীকুল এই ''গ্লোবাল ওয়ার্মিং'' সমস্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

(২) **ভাসমান কঠিন কণাজনিত দূষণ** ঃ বায়ুতে বিভিন্ন জৈব কণা যেমন ফুলের পরাগ জীবাণু ইত্যাদি এবং কিছু সূক্ষ্ম ধূলিকণা মিশে থাকে যা প্রকৃতিজাত এবং স্বাভাবিক। এর উপরন্তু মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে নানা ধাতব পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যের সূক্ষ্ম কণা বা কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি বায়ুতে মিশছে যা শ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে নানা অসুখের সূচনা করে।

(৩) **ভাসমান তরল কণাজনিত বায়ুদূষণ** ঃ বায়ুতে কোনও রাসায়নিক তরলপদার্থের সূক্ষ্ম কণা ভাসমান অবস্থায় থেকেও দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন বাতাসে উপস্থিত অধাতব অক্সাইডগুলি জলীয় বাষ্পের সাথে প্রক্রিয়া করে বিভিন্ন অ্যাসিডকণা উৎপন্ন করে। এছাড়া বিভিন্ন কারখানায় অত্যাধিক অ্যাসিড ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাতাসে অ্যাসিড ধোঁয়াশার প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাতাসে এইসব অ্যাসিড এলাকার ঘরবাড়ী ও সৌধের উপরিস্তরকে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বলাবাহুল্য যে বাতাসে এই ধরনের অ্যাসিডকণার উপস্থিতি এলাকার মানুষের শরীরে দীর্ঘমেয়াদী থাকে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

(৪) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত বায়ুদূষণ** ঃ পরিবেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতির কিছু স্বাভাবিক উৎস আছে। যেমন উল্কাপাত ইত্যাদির মাধ্যমে বাইরে থেকে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে মেশা, পরিবেশে উপস্থিত কিছু বিশেষ ধাতু বা ধাতব যৌগ থেকে নিঃসৃত আণবিক দূষণের পরিমাণে নগণ্য। পারমাণবিক গবেষণাগার, কারখানা বা চিকিৎসাকেন্দ্র বা সুরক্ষা পরীক্ষায় ব্যবহৃত X-ray, তেজস্ক্রিয় (স্টেডিয়াম) ডায়ালযুক্ত ঘড়ি, লেসার টচ প্রভৃতি থেকে আণবিক বিকিরণ এবং বিশেষতঃ পারমানবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

তেজস্ক্রিয় দূষণের ফলে মানবদেহে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলো বমি, দুর্বলতা, রক্ত-পায়খানা, সংক্রামক অসুখে ভোগা ইত্যাদি দেখা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ যেমন চামড়ায় ফোস্কা পড়া, ফেটে যাওয়া, রক্ত পড়া, চুল উঠে যাওয়া ইত্যাদি ঘটে। তেজস্ক্রিয়তার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাবে, নানা মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয় যেমন লিউকিমিয়া ক্যান্সার, ছানি ও অন্য চোখের রোগ, থাইরয়েডের অসুখ ইত্যাদি দেখা যায় যা মা-বাবার থেকে সন্তানের মধ্যেও

সংক্রামিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ষ্ট্রনসিয়াম, সিজিয়াম, কার্বন (C_{14}) ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় দূষক পদার্থ। (বা তা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন রশ্মিসমূহ, যেমন- গামা রশ্মি, আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, X-ray রশ্মি ইত্যাদি)।

3.2.2 বায়ুদূষণের কারণ ঃ

(১) **প্রাকৃতিক কারণ ঃ** বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বায়ুদূষণ ঘটে থাকে যদিও তার পরিমাণ এবং ক্ষতিকারকতা মানুষের দ্বারা কৃত দূষণের তুলনায় নগন্য। বায়ু দূষণের কয়েকটি প্রধান প্রাকৃতিক কারণ হল,

(ক) দাবানল, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও সালফার, ম্যাঙ্গানীজ, ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি ধাতু বা অধাতব কণাজাতীয় পদার্থ।

(খ) জলাভূমি অঞ্চলে বা জীবদেহের পচনের ফলে সৃষ্ট মিথেন (CH_4) গ্যাস।

(গ) কয়লা ও পেট্রোলিয়াম খনিজাত গ্যাস, যেমন— মিথেন (CH_4), কার্বন মনোক্সাইড (CO)

(ঘ) উল্কাপাতের ফলে ধাতু কণা

(ঙ) মহাজাগতিক ভারি ধূলিকণা,

(চ) গ্রহগুলির আবর্তন ও পারস্পরিক দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে সংঘটিত নানা আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া জাত বায়ুদূষণ।

(ছ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অ্যালার্জি, ফানগাই ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এইসকল প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বায়ুদূষণ থেকে অনেক বেশী উদ্বেগজনক বলে মনে করেন, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন কৃত্রিম বায়ুদূষণকে কেননা যদিও এই সব দূষণগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, তবুও শুধুমাত্র মানুষের অবিবেচনার ফলে এই দূষণের পরিমাণ নিরন্তর দ্রুতহারে বেড়েই চলেছে এবং এর ক্ষতিকারতা প্রত্যেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত ব্যাপক। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন ভাবে বায়ুদূষণ ঘটেছে যার প্রভাবে পরিবেশের অন্য উপাদানগুলিও নানাভাবে দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকটি প্রধান দূষণকারক সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

(২) **যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ ঃ** মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন আধুনিক পরিবাহন মাধ্যম থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করে। স্থলপথে যাত্রীবাহী যান বা মালগাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত বাস, ট্রেন, মোটরগাড়ি, টেম্পো, লরি, ট্রাক ইত্যাদিতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদির সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ দহনের ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস যেমন কার্বন মনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) লেড-অক্সাইড প্রভৃতি বাতাসে মিশে যায়। এছাড়া দহন না হওয়া কিছু হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগ, পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন বা কার্বন কণা এবং লেড মোম ইত্যাদি বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় মিশে যায়। এদের মধ্যে লেডযুক্ত পেট্রোল থেকে সৃষ্ট লেড কণা ও লেড-অক্সাইড গ্যাস প্রচন্ড বিষাক্ত যা শরীরে চিরস্থায়ী ব্যধি সৃষ্টি করে।

স্বভাবতই শহরাঞ্চলে যানবাহন এবং মালগাড়ির অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে এইজাতীয় বায়ুদূষণের পরিমাণ অত্যাধিক। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতের বড় শহরগুলিতে মোট বায়ু দূষণের অর্ধেক ভাগ সৃষ্টি হয় পরিবহন সংক্রান্ত অসতর্কতার দরুণ।

এ ছাড়া সামুদ্রিক ও বায়ুযান থেকে নির্গত ধোঁয়া বিশেষত যুদ্ধযান বা অন্য সামরিকযান নিঃসৃত গ্যাসগুলি পরিবেশকে প্রবল মাত্রায় দূষিত করে।

পরিবহনের জন্য রাস্তা, পুল ইত্যাদি তৈরীতে পিচ গলানোর সময় যে ধোঁয়া বেরোয় তাতে বেঞ্জাপাইরিন যৌগ থাকে যার থেকে ক্যানসার রোগ হয়।

(৩) **শিল্পজাত বায়ুদূষণ ঃ** শিল্পাঞ্চলগুলির কলকারখানা থেকে নানা গ্যাস, ধোঁয়া এবং তাতে ভাসমান অতিক্ষুদ্র ধাতব বা অধাতব রাসায়নিক পদার্থের কণা বায়ুতে মিশে যায়। প্রধানতঃ গতশতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের পরিবর্তী পর্যায়ে শিল্পাঞ্চলের অত্যাধিক প্রসার ও সেখানে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ছাড়াই নানা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এই দূষণের কারক। প্রাথমিকভাবে এই দূষণ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকাকে প্রভাবিত করলেও পরবর্তীকালে বায়ু ও জলের প্রবাহমানতার কারণে অত্যন্ত দ্রুত হারে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প ও শিল্পজাত বায়ুদূষণগুলি হলো,

বিদ্যুৎ শিল্প— তাপ বিদ্যুৎ ও অন্য শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, ধাতুকণা ও ছাই।

অ্যাসিড শিল্প— ক্লোরিন, সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) সালফার ট্রাই অক্সাইড (SO_3), ফ্লুওরাইড ক্লোরাইড যৌগ সারশিল্প— অ্যামোনিয়া গ্যাস

পেট্রোলিয়াম শিল্প— পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ও পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা থেকে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন যৌগ, ফরম্যালডিহাইড, লেড ও সালফার যৌগ।

রাসায়নিক শিল্প— বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ, ধাতব যৌগ, বিষাক্ত রাসায়নিকের ধোঁয়া, রঙ বা বার্নিস শিল্পের উৎবৃত্ত পদার্থ, সিমেন্ট কারখানার থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম কঠিন ধূলিকণা।

অস্ত্র কারখানা— বিভিন্ন পারমাণবিক বা অন্য শক্তিশালী বোমা তৈরীতে ব্যবহৃত বিষাক্ত গ্যাসগুলি, জীবাণুবোমা এবং রকেট তৈরীর রাসায়নিক পদার্থ বায়ুতে মিশে দূষণ সৃষ্টি করে।

শিল্পজাত বায়ুদূষণের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি বিশেষ দুর্ঘটনার বিবরণ থেকে যা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা— শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনার ফলে সর্বাত্মক বায়ুদূষণের ঘটনাটি ঘটেছিলো ভারতবর্ষের ভূপাল শহরে 1984 সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিন কীটনাশক দ্রব্য প্রস্তুতকারী ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় মিক প্ল্যান্ট থেকে মিক (MIC) বা মিথাইল আইসো-সায়ানেট নামক অতি বিষাক্ত ও উদ্বায়ী গ্যাস মুক্ত পরিবেশের বায়ুতে মিশে গিয়ে ব্যাপক জীবনহানি ঘটায়। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ২৩০০ মানুষ এতে মারা পড়ে। দুলক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। অসংখ্য জীবজন্তু (বিশেষতঃ গবাদি পশু) ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার দিন মিক গ্যাস ট্যাঙ্কের সংলগ্ন ফ্রিজ খারাপ হয়ে গ্যাসের উষ্ণতা $0^{o}C$ থেকে বাড়িয়ে দেয়। অতঃপর কোনোভাবে গ্যাসটি জলের সংস্পর্শে আসে যার ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অত্যাধিক তাপ ও চাপ তৈরী হলে ট্যাঙ্কের সেফটি ভালব খুলে ঐ বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে যায়। নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি স্বাভাবিক ভাবে চালু না থাকায় গ্যাসটি দাহ্য হলেও পুড়িয়ে দেওয়া বা অন্য ট্যাঙ্কে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কারখানার পাশের বস্তি অঞ্চলে থাকা হাজার হাজার মানুষ সতর্ক হবার সামান্যতম সুযোগটুকুও পাননি এবং অসহায়ভাবে মারা যান।

চেরনোবিল দুর্ঘটনা— 1986 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের রিঅ্যাক্টরে দুর্ঘটনার ফলে প্রচন্ড পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাস মাটি জলে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ছাড়াও পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত নানা রোগব্যাধি বিকলাঙ্গতা, ক্যানসার প্রভৃতি আক্রমণ ঘটতে থাকবে। বলাবাহুল্য এই তেজস্ক্রিয়তা বায়ুমাধ্যমে সর্বাধিক দ্রুত হারে সমস্ত এশিয়া ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে বহু অজানা রোগ ভাইরাস সংক্রামণ ও পঙ্গুতা মানুষ ও পশুপাখি সবার মধ্যেই দেখা দেয়। পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বা পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা ফলে এভাবে কয়েক প্রজন্ম ধরে সুস্থ জীবনের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে।

1952 সালে লন্ডনের সৃষ্ট বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড ধোঁয়াশার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় 4 হাজার মানুষ

মারা যায় এবং পরবর্তী কয়েক মাসে আরও 8 হাজার মানুষ মারা যায়। 1979 সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি জৈব অস্ত্র গবেষণাগারে অ্যানথ্রেক্স যৌগ নিঃসরণের ফলে কয়েকশো মানুষ মারা যান।

(৪) **গৃহজাত বায়ুদূষণ ঃ** মানুষের বাসগৃহ ও কর্মপ্রতিষ্ঠানে রন্ধন, বা উত্তাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন মনোক্সাইড বা অবিশুদ্ধ জ্বালানী দহনের ফলে অন্যান্য ধাতব বা অধাতব অক্সাইড উৎপন্ন হয় যার অধিকাংশই বিষাক্ত। অত্যাধিক মাত্রায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড হলো পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়। এছাড়া জমা আবর্জনার পচন, অবহন যোগ্য নর্দমা ইত্যাদি থেকে অজৈব গ্যাস, জীবাণু ও ভাইরাস ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। জমা জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলতে গিয়েও কিছু ক্ষতিকর গ্যাস তৈরী হয়। যেমন প্লাসটিক দহন।

পৃথিবীর কিছু অংশে ভূপৃষ্ঠ থেকে রেডিও অ্যাকটিভ বিকিরণ ঘটে থাকে যার থেকে রেডন (Rn) গ্যাস উৎপন্ন হয়। গৃহ বা অন্য আবদ্ধ স্থানে এই গ্যাস বিকিরিত হতে না পারার ফলে মাটি সংলগ্ন একটি বিষাক্ত গ্যাস স্তর তৈরী হয়। রেডন গ্যাসের কারণে সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় দুহাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

বাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত প্লাইউড ও কার্পেন্টিং পদার্থ থেকে ফরম্যালডিহাইড গ্যাস এবং রঙ, বার্নিশ ও রঙের দ্রাবক ইত্যাদি শুকানোর সময় তা থেকে বিভিন্ন জৈব যৌগের গ্যাস উৎপন্ন হয়। রঙ থেকে সীসা বা লেড অক্সাইড বায়ুতে মিশে যায়। ফায়ারপ্লেস বা রান্নার স্টোভ, উনুন, বার্নারে ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি দহনে উৎপন্ন ধোঁয়া, গ্যাস এবং কঠিন কণা জাতীয় দূষণ শ্বাসকষ্ট তৈরী করে।

বাড়ি, খামার ইত্যাদিতে কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক বা অন্য রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে মিশে শ্বাসের সাথে প্রাণীদের শরীরে ঢুকে যায়।

জামাকাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত সাবান, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি এবং ড্রাই ক্লিনিং-এর কাজে ব্যবহৃত টেট্রাক্লোরাইড বায়ুদূষণ ঘটায়।

বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্যবহৃত অ্যাসবেস্টাস থেকে অ্যাসবেস্টোসিস্ নামক ক্রনিক রোগের সৃষ্টি হয় যা ফুসফুসে প্রদাহ এবং ক্যানসার সৃষ্টি করে। খনি অঞ্চলে বা গৃহনির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের শরীরে এই রোগ সৃষ্টি হয়। বসতি অঞ্চলে মানুষ ও পোষা প্রাণী যেমন কুকুর বেড়াল ইত্যাদির সংখ্যার আধিক্য থেকে নানা মাইক্রোটক্সিন, জীবাণু, ভাইরাস এবং নানা জৈব বর্জ্য পদার্থ থেকে মিথেন গ্যাস ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। ফ্রিজ এবং এয়ার কণ্ডিশনিং যন্ত্র থেকে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ও অন্যান্য বিষাক্ত যৌগ সৃষ্টি হয়। বাড়ির জলের পাইপ, ট্যাপ, নর্দমার মুখ থেকে বিভিন্ন সময়ে কিছু বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থ উৎপন্ন গ্যাস যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলবাহিত দূষণ যেমন আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি বায়ুর অক্সিজেন বা অন্য গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন কিছু ক্ষতিকর গ্যাস গৃহাভ্যন্তরের পরিবেশকে দূষিত করে।

ধূমপানের ফলে কার্বনমনোক্সাইড এবং কিছু নিকোটিন যৌগ উৎপন্ন হয়, যা ধূমপায়ী এবং আশেপাশের সকল ব্যক্তির শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বায়ু দূষক ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা মানুষের দ্বারা কৃত বায়ুদূষণ যার সম্বন্ধে জানলাম সেগুলি হলো উৎস থেকে সরাসরি সৃষ্ট বায়ুদূষণ। যাকে আমরা প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ বায়ুদূষক বলে থাকি। এই ধরনের কিছু দূষক পদার্থ বায়ুমণ্ডল বা পরিবেশের অন্য উপাদানের সংস্পর্শে এসে কোন বিক্রিয়ার ফলে আরও বেশি ক্ষতিকর দূষক তৈরী করে। যাদের পরোক্ষ দূষণ বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাড়ির রান্নাঘর, যানবাহন ও কলকারখানা নিঃসৃত ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থগুলি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এক বিষাক্ত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে। যার মধ্যে বিভিন্ন অ্যালডিহাইড ও কিটোন যৌগ, পার অক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট ইত্যাদি বায়ুদূষক মিশ্রিত থাকে। কিছু দূষক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ভাবেই সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন ধাতুর কণা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে উপযুক্ত তাপ ও চাপ পেলে বিষাক্ত অক্সাইড বা জলের সংস্পর্শে অ্যাসিড বাষ্প তৈরী করে। যেমন আগ্রায় যমুনা তীরবর্তী

পেট্রোলিয়াম শোধনাগার নিঃসৃত সালফার ডাই-অক্সাইড ঐ অংশের বায়ুতে অত্যধিক পরিমাণে মিশে যায় এবং পরে জলীয় বাষ্পের সাথে যুক্ত হলে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরী করে যা তাজমহলের মার্বেল পাথরকে অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত করে তুলেছে।

বনাঞ্চল হ্রাস ঃ নির্বিচারে নগরায়ন এবং শিল্পায়নের প্রয়োজনে অতি দ্রুত হারে বনাঞ্চল ধ্বংস করার ফলে প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদের অনুপাত প্রাণীর তুলনায় অত্যন্ত কমে গেছে। সবুজ উদ্ভিদ, যা সালোকসংশ্লেষকালে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাস করে বিশুদ্ধ অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশকে নির্মল রাখতো তা আজ বিলুপ্ত প্রায়।

বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে বসতিঅঞ্চল, শিল্পাঞ্চল ও কৃষিজমির পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বনভূমি, পাহাড়ি বাগিচা ইত্যাদি পুড়িয়ে বা কেটে জায়গা করা হচ্ছে। আবার কৃষি জমির ফসলের অবশেষ পুড়িয়েও গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। প্রতিবছর ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের প্রায় ৩ কোটী বনভূমি এভাবে নষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসের শোষক সবুজ উদ্ভিদ অন্তর্হিত হচ্ছে এবং অপরপক্ষে একই সাথে উৎপন্ন কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পূর্বে আলোচিত উপায়ে প্রচুর দূষক গ্যাস বিশেষতঃ কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধান শহরগুলি ঘনবসতীর কারণে দূষণের পরিমাণ বিপদসীমা ছাড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে।

সূক্ষ্ম কঠিন কণাজাত কিছু বিশেষ প্রকার বায়ু দূষণ ঃ বায়ুমণ্ডলে সর্বদাই নানা প্রকার সূক্ষ্ম কঠিন কণার অস্তিত্ব বর্তমান। যদি কিছু সূক্ষ্ম কণার বেশি মাত্রায় উপস্থিতি পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তবে তা বায়ুদূষণ রূপে চিহ্নিত হয়।

(১) **ধুলো** — বিভিন্ন বস্তুর প্রক্রিয়াকরণের সময় তার সূক্ষ্ম কণা বায়ুতে মিশে যায়, যা বায়ুর প্রবাহমানতার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আরও সূক্ষ্মকণা রূপে বায়ুতে থেকে যায়। যেমন, কাঠ বা কয়লার গুঁড়ো, ছাই, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি। এই সব কঠিন কণার মাপ সাধারণতঃ 0·1 থেকে 75 মাইক্রন পর্যন্ত হয়।

(২) **বাষ্প** — রাসায়নিক শিল্প ও খনিজ শিল্প থেকে উদ্ভুত বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সূক্ষ কঠিন বস্তুকণায় রূপান্তর। কণার মাপ ·03 মাইক্রন থেকে ·3 মাইক্রন।

(৩) **মিস্ট** — বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প বা প্রক্রিয়াজাত কারণে উৎপন্ন বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সূক্ষ্ম তরল কণার সৃষ্টি যা বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। কণার মাপ 0·5 মাইক্রন থেকে 3 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

(৪) **ধোঁয়া** — কার্বনজাত বস্তুর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন কঠিন কণা যুক্ত বায়ু। কণার মাপ ·05 মাইক্রন থেকে 1 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

3.2.3 বায়ুদূষণের ক্ষতিকারক ফলাফল ঃ

পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষক পদার্থগুলি ক্রমাক্রম বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুর স্বাভাবিক মিশ্রণের অনুপাতকে প্রভাবিত করছে। বায়ু দূষিত হলে সেই বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার সময় ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ ও কার্বন কণাগুলি মানুষ ও অন্য প্রাণীর দেহে মিশে যাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষের ফলে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। বায়ুতে উপস্থিত বিভিন্ন সূক্ষ্ম কঠিন কণা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে জমা হলে তার ফলে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন বালিকণা জমে সিলিকোসিস, কয়লার গুঁড়ো থেকে অ্যানথাকোসিস, অ্যাসবেসটস্ থেকে অ্যাসবেস্টোসিস্ ইত্যাদি। বায়ুদূষণের ফলে উদ্ভিদের ফলন ও বৃদ্ধিতেও নানা ক্ষতি ঘটে। এছাড়া বাড়ি বা সৌধের বাইরে দেওয়ালে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। কয়েকটি প্রধান দূষকের ক্ষতিকর প্রভাব এখানে ব্যাখ্যা করা হলো।

কার্বন মনোক্সাইড (CO) — গ্যাসটি একটি বিষাক্ত পদার্থ। এটি বায়ুতে মিশে গেলে মাথাযন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, বমিভাব, ক্লান্তি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটি হৃদযন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিবহণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বায়ুতে অধিক মাত্রায় কার্বনমনোক্সাইডের উপস্থিতি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) — বিষাক্ত ধোঁয়া সৃষ্টি করে। বায়ুতে মিশে মানুষের শরীরের সংস্পর্শে এলে চোখ জ্বালা করে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ হয়, নাক, গলা ও ফুসফুসের ক্ষতি করে। ব্রংকাইটিস, হাঁপানি থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_3) তৈরী করে যা অ্যাসিড বাষ্প ও অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটায়। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ফসলের ক্ষতি হয়, বনাঞ্চলের সবুজ উদ্ভিদের পাতার ক্লোরোফিল (যা তার খাদ্যউপাদনের আধার) নষ্ট করে উদ্ভিদের ক্ষতি করে এর ফলে রবিশষ্য ও ফলের চাষ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিষাক্ত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে এটি বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে পারে এবং বাড়ি, সৌধ ইত্যাদির বহির্গাত্রে ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে।

নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2)— বাতাসে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড উপস্থিত থাকলে ফুসফুস ও হৃৎযন্ত্রের অসুখ দেখা দেয়। শ্বাসনালী এবং স্বরনালীতে জ্বালা করে ও ক্ষয় ঘটে। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, স্নায়ুজাত রোগ দেখা দেয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। এই গ্যাসের বাতাসে মাত্র 0·05 শতাংশ উপস্থিতিই মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অপরপক্ষে উদ্ভিদের উপরেও এর ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। যদিও উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের বা অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ প্রয়োজন কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও বাতাসে NO_2 বা নাইট্রোজেনের অন্যান্য অক্সাইডগুলি যেমন N_2O বা নাইট্রোজেনের অন্যান্য অক্সাইডগুলি যেমন N_2O, NO, N_2O_5 ইত্যাদির উপস্থিতি ক্ষতিকারক হয়ে দেখা দেয়। এর ফলে উদ্ভিদের পাতার সবুজ রঙ বা ক্লোরোফিল কণা নষ্ট হয়, ফলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। চারাগাছ বা লতাজাতীয় উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়।

হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S)— বাতাসে এই গ্যাসের উপস্থিতি শিল্প কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকার ফল। এই গ্যাসের কারণে শরীরে তাৎক্ষণিকভাবে স্নায়ুর রোগ (যেমন মাথা ধরা) হয় শরীরের উন্মুক্ত অংশে, চোখ ও শ্বাসনালীতে জ্বালা করে, অক্ষুধা, হজম না হওয়া, গা বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট দেখা যায়।

ওজোন (O_3)— বাতাসে ওজোন গ্যাসের উপস্থিতির ফলে মাথা যন্ত্রণা চোখের রোগ ইত্যাদি তাৎক্ষণিক সমস্যা দেখা দেয়। এই গ্যাসের উপস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক পরিমাণ হলে (যা একান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ) তা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ ও ক্যানসার জাতীয় রোগের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের পাতা ক্লোরোসিস রোগে হলুদ হয়ে যায়।

ক্লোরিন (Cl_2)— অ্যাসিড বা ধাতু নিষ্কাষণ প্রভৃতি শিল্পজাত ক্লোরিন বা ধাতব ক্লোরাইড গ্যাসগুলির বাতাসে উপস্থিতি শ্বাসকষ্ট এবং চোখের রোগ বৃদ্ধি করে।

হাইড্রোকার্বন যৌগ— বেঞ্জিনে জাতীয় যৌগ বাতাসে বেশী মাত্রায় উপস্থিত থাকলে শ্লেষা বৃদ্ধি করে শ্বাসনালী রুদ্ধ করে দেওয়া, ফুসফুসের ক্ষতি, ক্যানসার রোগ প্রভৃতি ঘটে। ইথিলীন বা অ্যাসিটিলিনের প্রভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায় ফলতঃ ফসল উৎপাদন, বৃক্ষের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

লেড ও লেড অক্সাইড— মূলতঃ গাড়ীতে ও কারখানার মেশিনে লেডযুক্ত পেট্রোল ব্যবহারের ফলে বাতাসে লেডের কণা বা লেড অক্সাইড মিশে যায়। এটি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ক্ষতি করে রক্তের লোহিত কণিকা বিনষ্ট করে।

অ্যামোনিয়া— সার তৈরীর কারখানা, কোক-চুল্লী এবং হাসপাতাল ইত্যাদির হিমঘর থেকে অ্যামোনিয়া (NH3) গ্যাস নির্গত হয়। এটি ক্ষারধর্ম সম্পন্ন দূষক গ্যাস। এর সংস্পর্শে এলে চোখের ক্ষতি হয়। এছাড়া শ্বাসনালী জ্বালা করা এবং ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মিথেন— জলকাদাযুক্ত অঞ্চল যেখানে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর স্বাভাবিক পরিচলন স্রোতের অভাব ঘটে যেমন জলাভূমি, ধানজমি বা পরিত্যক্ত নীচু জমি এমন স্থানে সৃষ্টি হয়। জীবদেহের পচন, উদ্ভিদের পাতা, ডালপালার পচন এবং

পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ যেমন গবাদি পশুর মলমূত্রের ক্রমসঞ্চয় এবং তার উপর ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া থেকে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। জলাভূমি অঞ্চলে এর ফলে আলেয়া দেখা যায়। এটি একটি গ্রীনহাউস গ্যাস যার তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় 25 গুণ বেশী। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য ও পশুপালন দুটি প্রধান জীবিকা এবং ধান জমির পরিমাণ অনেক বেশী। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের পরিবেশে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেশী যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশই বিপদজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্লোরোফ্লুরোকার্বন জাতীয় যৌগ— এই যৌগগুলি ফ্রিজ, হিমঘর (যেমন মর্গ, মাছ-মাংস সংরক্ষক ঘর) মোটরগাড়ী এবং তরল প্রসাধন জাতীয় স্প্রে প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। এই যৌগগুলির প্রত্যক্ষ মানবদেহের ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াও গ্রীন হাউস গ্যাস রূপে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ওজোন গ্যাস স্তর ধ্বংসকারী প্রভাব বর্তমান।

গ্রীন হাউস এফেক্ট ঃ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনাকে গ্রীন হাউস এফেক্ট বলা হয়।

গ্রীন হাউস হলো শীতপ্রধান দেশে সবুজ গাছপালা উৎপাদন ও পরিচর্যার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী কাচের ঘর। এই ধরনের ঘরে রোদ প্রবেশ করে অবাধে কিন্তু মেঝে থেকে নির্গত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মির কারণে ঘরের আলো ও তাপ ঘরের বাইরে নির্গমণে বাধা সৃষ্টি করে এবং ঘরের মধ্যে তাপ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই ঘরগুলিকে গ্রীন হাউস বলে থাকে কারণ ঘরের মধ্যে সবুজ উদ্ভিদের জন্ম দিতে এই পরিবেশ অত্যন্ত উপযোগী, যদিও ঘরের বাইরে পরিবেশ থাকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা এবং উদ্ভিদহীন।

বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং অন্য কয়েকটি গ্যাস আবহমণ্ডলে গ্রীন হাউসের অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরী করে। এই গ্যাসগুলি পৃথিবী থেকে বিকিরিত বা প্রতিফলিত তাপকে রশ্মি আকারে শোষণ করে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলেই আটকে রাখে। এভাবে ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে বায়ুদূষণের ফলে পরিবেশে এই সব গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আবহমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর ফলে জলবায়ু এবং বাস্তুতন্ত্রে বিপদজনক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

গ্রীনহাউস এফেক্টের ফলে নিকট ভবিষ্যতে মানুষ ও মানবসভ্যতার অস্তিত্ব সঙ্কটময়। গড় ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের জল অতি দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টিপাতের রকমফের ঘটাতে পারে যার সম্ভাব্য ফলাফল হলো কোন স্থানে বন্যা এবং অন্য কোথাও ক্ষরার প্রাদুর্ভাব।

ভূতাপমাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফস্তর গলে গিয়ে সমুদ্র জলতল স্ফীত করতে পারে। প্রসঙ্গত বিগত শতাব্দীতে সমুদ্রজলতল 0·15 মিটার স্ফীত হয়েছে। এর প্রাবল্য ঘটলে পৃথিবীর বহু সমুদ্রতীরবর্তী নিচু অঞ্চল বিশেষতঃ বদ্বীপ অঞ্চল বা নিম্নভূমি ও সমভূমিতে জলস্তর আছড়ে পড়ে প্লাবন ঘটাতে পারে।

এছাড়া ভূমিক্ষয়, ভূমির অনুর্বরতা প্রভৃতি সমস্যার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই একই হারে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও তার জন্য জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনসহ ভারতের উপকূলবর্তী বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। ফলতঃ বহু মানুষকে গৃহহীন হতে হবে।

ওজোনস্তরে ছিদ্র বা ফাটল সৃষ্টি ঃ

শান্তমণ্ডলীয় ওজোন স্তর — ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 – 35 কিলোমিটার উচ্চতায় বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরকে শান্তমণ্ডল বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন (O_2) গ্যাসের অণু এই অংশে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে ভেঙ্গে যায় এবং তিনটি অক্সিজেন পরমাণু পুনর্বিন্যস্ত হয়ে ওজোন অণু (O_3) গঠন করে।

ওজোন স্তরের প্রয়োজনীয়তা — ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বাতাসে ওজোন গ্যাসের অস্তিত্ব ক্ষতিকর দূষণের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু শান্তমণ্ডলের ওজোনস্তরের অস্তিত্ব পৃথিবীর জীবকূলের পক্ষে পরম কাম্য। সূর্যরশ্মি বিকিরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসার

সময় তার মধ্যস্থ অতিবেগুনী রশ্মি যা জীবকূলের পক্ষে মারাত্মক তার 99% ওজোন স্তরে শোষিত হয়। তাই ওজোন স্তর এক আবরণের মতো অতিবেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীর জীবজগৎকে সুরক্ষা প্রদান করে।

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর কোনও কোনও অংশে এই ওজোনস্তর পাতলা বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে ১৯৭৯ সাল থেকে আন্টার্কটিকার বায়ুমণ্ডলীয় ওজোন স্তরে এক ফাটল সৃষ্টি হয়েছে যা ক্রমশ আরও বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। পরবর্তীকালে জানা যায় অন্যান্য অংশেও ওজোনস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

ওজোন স্তর এভাবে পাতলা হতে থাকলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সরাসরি অধিক মাত্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাবে যার পরিমাণ জীবজগতের পক্ষে হবে মারাত্মক ক্ষতিকর। অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে চোখে ছানি পড়া, নানান চর্মরোগ, এমনকি ক্যান্সার হওয়াও সম্ভব। অতিবেগুনী রশ্মি পড়ার জন্য অনেক ফসল নষ্ট হবে বা তার গুণগত মান হ্রাস পাবে। গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং খাদ্য শৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবচেয়ে দ্রুত ধ্বংস হবে আন্টার্কটিকা অঞ্চলের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত।

এরই মধ্যে আন্টার্কটিকার জীবকূলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষের শরীরে বিভিন্ন চর্মরোগ এবং চামড়ায় ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অতিদ্রুত অধিক পরিমাণে ত্বকের ক্যান্সার এবং মেলামোনা রোগে আক্রান্ত হবার কারণ ওজোন স্তরের ক্ষয়প্রাপ্তি।

ওজোনস্তর ক্ষয়প্রাপ্তির মূল কারণ হলো ক্লোরো ফ্লুরোকার্বন জাতীয় যৌগের বহুল ব্যবহার। এছাড়া মিথাইল ক্লোরোফর্ম, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ইত্যাদি রাসায়নিক, দূষণ পদার্থের বায়ুতে উপস্থিতি ওজোন স্তরের ওজোন অণু ভাঙ্গতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

ওজোন স্তরকে রক্ষা করার জন্য ঐ জাতীয় যৌগগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা বাতাসে সেগুলির নির্গমণ রোধ করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বাতাস থেকে ঐ যৌগগুলি সংগ্রহ করে ওজোনস্তরে পৌঁছাবার আগেই তাদের বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।

3.2.4 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে বহু আন্দোলন, গবেষণা, লেখালেখি, সভাসমিতি, সেমিনার ইত্যাদি করা হচ্ছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো জাতি-ধর্ম-বাসস্থান নির্বিশেষে সমাজের সকলস্তরের মানুষকে বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি সম্পর্কে অবহিত করা। কারণ সচেতন মানুষই তার পরিবেশ রক্ষায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে। বায়ুদূষণ এতটাই ব্যাপক ও মারাত্মক যে শুধুমাত্র কিছু মানুষের সদিচ্ছা নয় সবার যৌথ উদ্যোগ, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই এই সমস্যাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বায়ুদূষণ নিবারণে অবিলম্বে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া প্রয়োজন তা হলো—

(১) কলকারখানা, শিল্প ক্ষেত্রে এবং জনজীবনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসকে সরাসরি বাতাসে ছাড়ার আগে যান্ত্রিক উপায়ে পরিশুদ্ধ করা। যানবাহন ও রান্নাঘরে জ্বালানীর দহনে সৃষ্ট গ্যাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া যে বিষাক্ত পদার্থগুলি নানাভাবে সৃষ্ট হয় তার দূরীকরণে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই পদার্থগুলি ফিল্টার সাইক্লোন সেপারেটর (ধুলোময়লা অপসারণের জন্য), ক্যাটালাইটিক কনভার্টার (যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন যৌগগুলির জারণের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর দূষকে রূপানত্র করার জন্য), ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটর (অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তুকণা পৃথক করার জন্য বিশেষত তামা, দস্তা শিল্পে ব্যবহৃত হয়) প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার পৃথক করা হয়।

(২) উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে যার ফলে দূষিত পদার্থের উৎপাদন কমে যাবে। ফলে যানবাহন, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা থেকে গ্যাস বা কঠিন দূষণকারী কণার নিঃসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) দহনের জন্য ব্যবহারের পূর্বে জ্বালানীর বিশুদ্ধকরণ করতে হবে, যার ফলে লেড ও ক্ষতিকর ধাতব অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত ধাতুজাত রাসায়নিক দূষণ উৎপাদন কমবে।

(৪) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কম করতে হবে। ধাতুনিষ্কাশন চুল্লী নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়াকে পরিস্রুত করে বাতাসে ধোঁয়াশা বিশেষত সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমাতে হবে।

(৫) যথেষ্ট পরিমাণে গাছ লাগিয়ে বনসৃজন করতে হবে যায় ফলে পরিবেশে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৬) অপ্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তির উৎস সন্ধান ও তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লা, পেট্রোলিয়াম দহনের পরিমাণ কমাতে হবে।

(৭) কাঠের চোরাচালান ব্যবসা বন্ধ করতে হবে এবং বিকল্প বস্তু নির্মিত আসবাবের ব্যবহার শুরু করতে হবে।

(৮) জৈব আবর্জনার সঠিক রূপান্তর ঘটাতে হবে যাতে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি না পায়।

(৯) ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(১০) তেজস্ক্রিয় দূষণ রোধের জন্য পারমাণবিক গবেষণাগারগুলিতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। X-ray মেশিন, রেডিওথেরাপির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ পোশাক ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তা রোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

3.3. জলদূষণ (Water Pollution)

বিশুদ্ধ জল হলো দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি যৌগ (H_2O)। পৃথিবী পৃষ্ঠে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া জলে বিভিন্ন জৈব, অজৈব পদার্থ, নানা ভৌত ও রাসায়নিক কণা এবং নানা জীবাণু ইত্যাদি ভাসমান বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। যদি এই ধরনের কোন উপস্থিতির ফলে জলের গুণগত মানের বিশেষভাবে অবনতি ঘটে এবং ঐ জল কৃষিকাজ ও পানীয় হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে তবে আমরা একে জলের দূষণ বলে চিহ্নিত করে থাকি।

সংজ্ঞা ঃ জলের মধ্যে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাবার ফলে যদি জলের ভৌতধর্ম বা রাসায়নিক ধর্ম বা জৈব বৈশিষ্ট্য ও গুণমানের এমন কোন পরিবর্তন হয় যার ফলে জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী বা মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা ঘটে তবে সেই পরিবর্তনকে জলদূষণ বলা হয়।

3.3.1 জলদূষণের উৎস ঃ

(১) মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফলে তার দ্বারা ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন জলের উৎসগুলি দূষিত হয়। ঘরবাড়ির দৈনন্দিন আবর্জনা মাটিতে ফেলার ফলে মাটির ভৌম জলস্তর দূষিত হয় এবং জলে নানা রাসায়নিক ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু মিশে যায়। মাটির ভৌমজল থেকে ঐ দূষণ পাশ্ববর্তী ছোট ছোট জলাধার যেমন পুকুর, কুয়ো ইত্যাদির জলকে দূষিত করে। ফলে জলে বিভিন্ন রঙ ও দুর্গন্ধ তৈরী হয়। প্রাথমিক ভাবে জল ঘোলাটে হয়ে ওঠে, পরে দূষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে লালচে, সবুজ বা কালো হয়ে যায়। সাধারণভাবে জৈব অ্যামাইনোর উপস্থিতিতে জলে আঁশটে গন্ধ, জৈব হিউমাসের উপস্থিতিতে সোঁদা গন্ধ, হাইড্রোজেন সালফাইড বা ফসফরাস যুক্ত জলে পচা ডিমের গন্ধ থাকে।

(২) শিল্পকারখানাগুলির পরিত্যক্ত আবর্জনা ও উৎবৃত্ত রাসায়নিক পদার্থ সাধারণতঃ নর্দমা দিয়ে সংলগ্ন কোন জলের উৎসে স্থানান্তর করা হয়, যেমন সমুদ্র, নদী, খাল ইত্যাদি। ঐ সব আবর্জনার মধ্যে বিভিন্ন ধাতু যেমন সীসা, তামা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম বা বিভিন্ন ধাতব যৌগ, জৈব পদার্থ, এবং অজৈব সালফার, ফসফরাস, ফ্লুওরিন ঘটিত যৌগ থাকে। এগুলি জলকে দূষিত করে। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—

(ক) পরমাণু শক্তিকেন্দ্রে ফ্লোরাইড যৌগ,

(খ) গ্যাস ও কোক শিল্পজাত অ্যামোনিয়া, ফেনল সায়ানাইড, সালফাইড যৌগ,

(গ) রং ও ব্যাটারী শিল্পজাত সীসা ও সীসার অক্সাইড,

(ঘ) মদ ও অন্য রাসায়নিক শিল্পজাত অজৈব অ্যাসিড, ফেনল যৌগ এবং জৈব অ্যাসিড,

(ঙ) তৈল শোধনাগার, পেট্রো রসায়ন শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ব্যবহৃত হাইড্রোকার্বন যৌগ, তেল, চর্বি, গ্রিজ ইত্যাদি,

(চ) চর্মশিল্পে ব্যবহৃত ট্যানিক অ্যাসিড, ফেনল, সালফাইড ও ক্রোমিয়াম যৌগ,

(ছ) সার শিল্পের উপজাত ফসফেট ও ক্লোরাইড যৌগ ইত্যাদি।

(৩) শহর ও গ্রামের সাধারণ শৌচব্যবস্থায় প্রত্যেক নর্দমা উন্মুক্ত হয় কোন বৃহৎ জলাশয় যেমন খাল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিতে এবং তার পূর্বে দূষিত জলের শোধনের কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়া বৃষ্টির জল আস্তাকুঁড়, খাটাল, শ্মশান, ভাগাড়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলাধারগুলিতে গিয়ে পড়লে তা দূষণ সৃষ্টি করে।

(৫) গৃহস্থলীর কাজে সাবান ও ডিটারজেন্ট দিয়ে জামাকাপড় যার ফলে বাসনপত্র ধোয়া হয়, বর্জ্য জলে স্থায়ীভাবে কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে যার পরিশোধন বেশ কঠিন।

(৬) জৈব আবর্জনা যেমন গাছের পাতা, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ, ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ পচনের ফলে পচনশীল সূক্ষ্ম জৈব কণা, রোগজীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে।

(৭) দুর্ঘটনা বা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে খনিজ তেল ও তেলের উপজাত দ্রব্যাদি সমুদ্রে পড়লে তা প্রাণঘাতী দূষণ সৃষ্টি করে। জাহাজ ডুবি, দুটি জাহাজের মধ্যে বা কোন জাহাজের সাথে চোরাপাহাড়, ডুবোপাথর, হিমশৈলের ধাক্কা, ট্যাঙ্কার থেকে ছিদ্রপথে তেল চুঁইয়ে পড়া, সমুদ্রে ট্যাঙ্কার সাফ করা, সমুদ্রগর্ভের তৈলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনের সময় দুর্ঘটনা, সমুদ্র তলদেশের তেলের পাইপলাইনগুলি থেকে তেল পড়া ইত্যাদি ভাবে সমুদ্রে তেল মিশতে পারে। বর্তমানকালে ইরাক-ইরাণ-কুয়েত সংলগ্ন সমুদ্রে যুদ্ধ লাগার ফলে তেল ঢেলে শত্রুপক্ষের ক্ষতি করার চেষ্টায় সমুদ্রের হাজার হাজার প্রাণী মারা গেছে। সমুদ্রের উপরিতলে ভাসমান তেলের আস্তরণ তৈরী হচ্ছে, যার ফলে জলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্য ও জীবনধারণে সমস্যা হচ্ছে। ঐ তেল জলবাহিত হয়ে বিরাট এলাকায় সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

(৮) পারমাণবিক অস্ত্র, বোমা ইত্যাদি সমুদ্রতলে পরীক্ষামূলক ভাবে বিস্ফোরণ করার ফলে প্রবল হারে সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ও দীর্ঘস্থায়ী রাসায়নিক দূষণের সৃষ্টি হয়।

(৯) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে নির্গত গরম জলে বিভিন্ন ধাতব যৌগ মিশে জলাশয়ের উষ্ণতা বৃধ্বি করে এবং জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব ধর্মের পরিবর্তন ঘটায়।

(১০) অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে জলে অম্ল ধর্ম দেখা দেয়। ফলে শুধু পানীয় হিসাবেই নয় স্নান এবং কৃষিকার্যে ব্যবহারের পক্ষেও ঐ জল দুষিত বলে গণ্য হয়।

প্রধানতঃ বাতাসে SO_2 ও NO_2 গ্যাসের দূষণ থেকে অ্যাসিড বৃষ্টির সৃষ্টি হয়।

$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$

$H_2O + SO_3 = H_2SO_4$

$H_2O + NO_2 = H_2NO_3$

বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে দ্রবীভূত অবস্থায় এই অ্যাসিড অণুগুলি থাকে যা বেশি ঘনীভূত অবস্থায় শিশির ও বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়ে।

(১১) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতিরিক্ত পরিমাণ সার বিষাক্ত কীটনাশক পদার্থ ও আগাছানাশক ওষুধ ইত্যাদি থেকে

নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশের নানা যৌগ তৈরী হয়। বৃষ্টি বা সেচের জলের সাথে মিশে এই সকল দূষিত পদার্থ জলাশয়গুলিতে সঞ্চিত হয়। এছাড়া জলের প্রবাহমানতার দরুণ ক্ষয়প্রাপ্ত মাটির কণার সাথে পেট্রোলিয়াম যৌগ মিশে জল দূষণ ঘটায়।

জলদূষণের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উৎস ঃ

জলদূষণের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে কিছু উৎসকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব কিন্তু সবক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত অর্থে উৎসকে চিহ্নিত করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ কোনও শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার পরিকল্পনা ও বর্জ্য প্রতিস্থাপন পদ্ধতিকে সামান্য পর্যবেক্ষণ করেই বলা সম্ভব যে তার মধ্যে কোন কারখানা বা কারখানাগুলি থেকে জলে দূষণ ছড়াচ্ছে। অনুরূপ পদ্ধতিতে যখন আমরা জানতে চাই যে কোনও কৃষি অঞ্চলের বিভিন্ন জমি ও তাতে চাষ হওয়া বিভিন্ন ফসল এবং ততোধিক বিভিন্ন সার ও কীটনাশকের মধ্যে থেকে কিভাবে পার্শ্ববর্তী জলাশয়টি দূষিত হয়েছে, তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়।

যে যে উৎস থেকে জল দূষিত হচ্ছে, তাদের যখন সরাসরি এবং যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং তাদের দ্বারা কিভাবে জল দূষিত হচ্ছে তা বোঝা যায়, তখন সেই সব উৎসকে দূষণের প্রত্যক্ষ উৎস (Point source) বলা হয়। যেমন— কলকারখানা, নালানর্দমা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, পারমাণবিক গবেষণাগার ও পরীক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি। যেহেতু এক্ষেত্রে দূষণের উৎসকে নির্ভুলভাবে সনাক্তকরণ সম্ভব তাই তাকে আইন করে নিয়ন্ত্রন এবং উন্নত যন্ত্রপাতি শোধন পদ্ধতি ইত্যাদির সাহায্যে নির্মূল করা সম্ভব।

অপরপক্ষে যদি দূষণের উৎসকে সরাসরি চিহ্নিত করা না যায় বা সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও ঐ দূষণ দূর করা কঠিন হয়, তবে সেই প্রকার দূষণকে জলদূষণের অপ্রতক্ষ উৎস (Non-point source) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ চাষবাস পদ্ধতি, রাস্তাঘাট ধোয়া নোংরা জল ইত্যাদি।

কৃষিকার্যে দূষিত জল ব্যবহারের প্রভাব ঃ

(১) দূষিত জলে চাষবাসের কাজে ব্যবহার করা হলে ব্যাকটিরিয়া ও মাটির মধ্যে বসবাসকারী জীবাণু, কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষতি হয়। ফলতঃ মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় যা এইসব প্রাণীর জীবনচক্রের দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

(২) মাটির দূষিত জলস্তর বা ভৌমজল থেকে মাটিতে ক্ষার অর্থাৎ ধাতব হাইড্রক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যা মাটিকে ক্ষারকীয় গুণবিশিষ্ট করে তোলে।

(৩) দূষিত জল শোষণ করে তার দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করলে উৎপন্ন শস্যের গুণগত মান হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ব্যহত হয়।

3.3.2 বিশুদ্ধ জলের ধর্ম ও গুণাবলি

জলের বিশুদ্ধতা এবং গুণাগুণ নির্ভর করে তার সকল ভৌত, রাসায়নিক ধর্ম এবং জৈব প্রকৃতির উপর। কতকগুলি ভৌতধর্ম যা জলের বিশুদ্ধতা বিচারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) **দ্রবীভূত বা ভাসমান পদার্থ ঃ** জলে নানাধরনের পদার্থ ভাসমান বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। ভাসমান সূক্ষ্ম বস্তুকণা, জৈব পদার্থ (যেমন তন্তু, তুলা, শৈবাল, জীবাণু ইত্যাদি) অথবা অজৈব পদার্থ (যেমন মাটি, পাথর, ইট ইত্যাদি) দূষণ হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারে। কিছু পদার্থ সরাসরি দূষণ হিসাবে কাজ করে যেমন ব্যাকটিরিয়া জীবাণু ইত্যাদি, আবার কিছু পদার্থ অন্য কোন পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন যৌগটি দূষক পদার্থ হয়। জৈব পদ্ধতিতে জৈব দূষণ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ উৎপন্ন হয়। জলে ভাসমান কণাজাতীয় দূষণকে ফিল্টার পদ্ধতি শোধন করা হয়।

(২) **ধাতব আধানের উপস্থিতি ঃ** উৎস অনুসারে বর্জ্য জলে নানা ধরনের ধাতুর তড়িৎযুক্ত পরমাণু উপস্থিত থাকে। সাধারণতঃ আমরা ক্ষতিকর তড়িৎ আধান রূপে চিহ্নিত করে থাকি মার্কারী, আর্সেনিক, অ্যান্টিমণি, ক্রোমিয়াম,

ক্যাডমিয়াম, বেরিয়াম, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর আয়নকে, যা অল্পমাত্রাতেই বিষাক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া স্পল্প ক্ষতিকর ধাতু হিসাবে আছে— সোডিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক ইত্যাদি।

ধাতব তড়িৎ আধানের মূল উৎস হল নানা রাসায়নিক শিল্প, তড়িৎ প্রলেপন এবং ধাতব দ্রব্যের ফিনিশিং-এর জন্য। জলে কোন ধাতুর আধান আছে, তা জানা থাকলে রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ধাতুটিকে অন্য কোন পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে পৃথক করে নেওয়া সম্ভব।

(২) ক্ষারতা — ক্ষারতার মাপক মাত্রা হলো pH. বিশুধ্ব জলের pH প্রায় সাত। এর কম pH যুক্ত জলকে আম্লিক এবং এর এর থেকে বেশি pH যুক্ত জলকে ক্ষারীয় বলা হয়। অম্লতা বা ক্ষারতা উভয়ই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই জলের pH সঠিক ভাবে সাত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৩) বর্ণ ও গন্ধ — বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন এবং গন্ধহীন। কেবল মাত্র দ্রবীভূত বা ভাসমান কণার জন্য জলে বর্ণ বা গন্ধ দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের (প্রধানতঃ কাপড় বা অন্য দ্রব্যে রঙ করা) উৎবৃত্ত বর্জ্য জলে রঙিন দূষক কণার উপস্থিতি থাকে। যা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। বর্ণ ও গন্ধ জলে দূষণের পরিচায়ক।

(৫) তাপমাত্রা — জলে উপস্থিত নানা জৈব ও অজৈব পদার্থ জলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জলের তাপমাত্রার উপর ঐ জলে বসবাস কারী উদ্ভিদ - প্রাণী ও জীবাণুদের জীবন নির্ভর করে। সাধারণতঃ ভূতলস্থিত জল ও শিল্পের বর্জ্য জলে তাপমাত্রা বেশি থাকে যা কোনও ভাবে জলাশয়ে মিশলে জলাশয়ের তাপমাত্রর তারতম্য সৃষ্টি করে।

(৬) দ্রাব্য অক্সিজেন (Dissolved Oxygen)— পরিমাণ যেহেতু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে শ্বাসগ্রহণের কাজে ব্যবহার করে, তাই জলে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণ ঐ সব প্রাণীদের জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় DO মাত্রা রূপে। জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ এবং বায়ুর অক্সিজেন হলো জলে উপস্থিত অক্সিজেনের উৎস।

জৈব অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand — BOD) ঃ

জৈব অক্সিজেনের চাহিদা (Biological Oxygen Demand) বা সংক্ষেপে BOD বলতে জলে উপস্থিত জৈব পদার্থ যেমন জলজ ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য অণুজীবীদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও বাড়বৃদ্ধির জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাহিদা বা ক্রমহ্রাসমান অবস্থাকে বোঝানো হয়। এটি ''মিলিগ্রাম প্রতি লিটার'' এককে প্রকাশ করা হয়।

শিল্প-কারখানা বা পৌর এলাকায় ব্যবহৃত বর্জ্য জলে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলি কিছু অতি ক্ষুদ্র জলচর প্রাণীর খাদ্য। ঐ সব জৈব বস্তুকে জৈব ক্ষয়িষ্ণু (biodegradable) বলে। যেমন শর্করা, প্রোটীন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, এস্টার ইত্যাদি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ। জল এই সকল জৈব পদার্থ দ্বারা দূষিত হলে সেই দূষিত পদার্থকে রাসায়নিকভাবে বিয়োজিত করার জন্য প্রয়োজন ব্যকটিরিয়া ও অণুজীবী প্রাণী। আমরা সাধারণভাবে জানি যে জল যতো বেশি পরিমাণ দূষিত হবে, ততই সেই জলে উপস্থিত ব্যাকটিরিয়া ও জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়বে এবং নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জলে উপস্থিত দূষিত পদার্থকে পচিয়ে পুষ্টিসঞ্চয় করতে চাইবে। এর জন্য জলে উপস্থিত অক্সিজেন বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকবে। ফলে দূষিত জলে জীবাণুর সংখ্যা যতো বাড়বে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ততো কমবে। জৈব পদার্থের জীবাণুঘটিত ক্ষয় হয় দুই প্রকারে—

(১) সবাত প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয় অক্সিজেন দ্বারা দূষক জৈব পদার্থের জারণ ঘটে।

(২) অবাত প্রক্রিয়া হলো বিজারণ পদ্ধতি যার দ্বারা হাইড্রোকার্বন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

অর্থাৎ জলে উপস্থিত জৈবক্ষয়িষ্ণু দূষক জৈবিক পদার্থের পরিমাণ ঐ জলে উপস্থিত আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের অক্সিজেন চাহিদা থেকে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ জৈব অক্সিজেন চাহিদা দ্বারা আমরা জলের জৈব দূষণের মাত্রা নির্ণয়

করি এবং প্রতি লিটার বর্জ্য জলে উপস্থিত জৈব পদার্থের সবাত জৈব ক্ষয়ের জন্য যতো মিলিগ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন তাকে ঐ জলের BOD মাত্রা বলা হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে ঐ মান নির্ণয়ের জন্য কোন জলের নমুনাকে পাঁচদিন 20ºC তাপমাত্রায় রেখে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কতটা কমেছে তা পরিমাপ করা হয়।

রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Demand) ঃ

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জলে প্রায়ই বিভিন্ন জটিল জৈব যৌগের দূষণ ঘটে যা দ্রুত জৈব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং এদের পরিমাণ BOD দ্বারা মাপা সম্ভব। এগুলি সাধারণভাবে যথেষ্ট স্থায়ী জৈব যৌগ যা সহজে বিয়োজিত হয় না এবং বহু বছর জলে অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের কোন জীবাণুর উপস্থিতিতে ধীর গতিতে বিয়োজিত হয়। এগুলি স্থায়ী এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর দূষণ।

উদাহরণস্বরূপ ক্লোরিনযুক্ত যৌগ, ফিনল এবং ফিনল জাতীয় জটিল হাইড্রোকার্বন, কিছু সাবান জাতীয় যৌগ, কীটনাশক পদার্থের মধ্যে অবস্থিত জৈব যৌগ। এই ধরনের পদার্থের মোট পরিমাপকে COD বলা হয়।

জৈব উপায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এমন রাসায়নিক পদার্থের জারণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনকে ঐ জলের রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলা হয় এবং মিলিগ্রাম প্রতি লিটার এককে প্রকাশ করা হয়।

3.3.3 জলদূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগব্যাধি

জলবাহিত ব্যাধি হলো কোনও মাইক্রোঅর্গানিস্‌ম-এর সংক্রমণ যা প্রধানতঃ পানীয় জল বা খাদ্য প্রস্তুতির কাজে ব্যবহৃত জলের দূষণের ফল। পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বছর জলবাহিত রোগের কারণে প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে (WHO-এর তথ্যানুসারে) অবিশুদ্ধ জলপান, শৌচালয়ের অপরিচ্ছিন্নতা বা অস্বাস্থ্যকর উপায়ে জলের ব্যবহার থেকে। জলবাহিত রোগগুলির প্রভৃতির সংক্রমণ প্রধান কারণ হয় প্রোট্রোজোয়া বা ভাইরাস বা জীবাণু (ব্যাকটিরিয়া) বা প্রধান পরগাছা (intestinal parasites) প্রভৃতির সংক্রমণ নিচের তালিকায় প্রধান কয়েকটি জলবাহিত রোগ, তাদের ধারক বাহক এবং রোগের উপসর্গ ও প্রকোপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ ঃ

দূষিত জল থেকে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণে নানান ধরনের রোগ হতে পারে। যেমন পানীয় ও খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত জলের দূষণ থেকে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। যেমন,

(i) কলেরা ঃ জলদূষণের থেকে সৃষ্টি হওয়া এই রোগ প্রায়শঃই ভারতের নানা গ্রাম বা মফস্বঃল এলাকায় মহামারী আকারে দেখা দেয়। এর ফলে রোগী দিনে ৩০-৫০ বার জলের মতো পায়খানা ও বমি করে। ফলে শরীর থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ জল বেরিয়ে গিয়ে অত্যধিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ এর প্রতিরোধের জন্য টীকা নেওয়া প্রয়োজন।

(ii) টাইফয়েড ঃ দূষিত জল পান করলে এই প্রকার জ্বর দেখা দেয়। এই রোগ ব্যাকটিরিয়া বাহিত এবং খাবার বা জলে মাছি বসার ফলে এটি ছড়ায়। এই রোগের ফলে প্রচন্ড জ্বর, শরীরে ব্যাথা, মাথাযন্ত্রণা ও পেটের অসুখ দেখা যায়।

(iii) কুষ্ঠ ঃ এটি একপ্রকার চর্মরোগ। দেহের অনাবৃত্ত অংশ, যেমন হাত বা পায়ের চামড়ায় সংক্রমণের ফলে এই রোগ দেখা দেয়। এর ফলে চামড়ায় কিছু অংশ লাল হয়ে ফুলে ওঠে। সেখানে ব্যাথা হয়। পরে ঐসব স্থান ঘা-এর মতো হয়ে যায় এবং তা থেকে পুঁজ ও রক্ত বের হয়। উপযুক্ত এই চিকিৎসায় এই রোগটির বর্তমানে সারানো সম্ভব। এটি একটি বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ।

এছাড়া আমাশা, জন্ডিস প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ জলদূষণের ফলে দেখা দেয়।

ভাইরাস ঘটিত রোগ ঃ

জলের দূষণ থেকে বিভিন্ন ভাবে মানবদেহে নানা ভাইরাসঘটিত রোগ হয়ে থাকে যেমন, হেপাটাইটিস্ A ও B, পোলিও, ভাইরাস ঘটিত নানা ধরনের জানা ও অজানা জ্বর ও প্রাসঙ্গিক রোগ ব্যধি।

(i) জলবসন্ত বা চিকেন পক্স— এটি একটি বায়ুবাহিত খুবই সংক্রামক রোগ। কিন্তু এটি নিরাময়যোগ্য। এতে জ্বর, মাথাযন্ত্রণা হয় এবং গায়ে গুটী বের হয়। টীকা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(ii) হেপাটাইটিস্ B— এটি খাদ্য ও জলে ভাইরাস সংক্রামণের ফলে ঘটে থাকে। শিশুরা দ্রুত এই রোগে আক্রান্ত হয়। এর রোগে মুখ-চোখ ও শরীরের চামড়ায় হলুদ রঙের আভা দেখা যায়। পেটে ব্যথা বমি ভাব ও হজমের সমস্যা হয়। এই রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে লিভারে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(iii) পোলিও— এই রোগ শিশুদের দেহে দ্রুত সংক্রান্ত হয়। এর থেকে অঙ্গ বিকৃতি এবং প্যারালিসিস্ হবার আশংকা তৈরী হয়। জন্মের পর বেশ কয়েকবার প্রতিরোধক টীকা গ্রহণ করলে এই রোগের সম্ভাবনা নির্মূল হয়।

(iv) পোষা প্রাণী বা পোকামাকড় থেকে সংক্রামিত রোগ— কুকুর থেকে জলাতঙ্ক, মাছি ও আরশোলা থেকে হেপাটাইটিস A ও E রোগের ভাইরাস সংক্রামিত হয়।

(v) মশার থেকে বিভিন্ন ভাইরাসঘটিত রোগ ছড়ায়। যেমন, ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া, জাপানীজ এনকেফেলাইটিস্ ইত্যাদি।

রাসায়নিক দূষণ ঘটিত রোগ ঃ

জলে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থেকে নানা ধরনের রোগ হতে পারে যেমন, (i) অ্যাসবেটসের যৌগ দ্বারা দূষিত জল থেকে অ্যাসবেসটোসিস ও ফুসফুসে ক্যান্সার হতে পারে।

(ii) আর্সেনিক যৌগ থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে নানা মারাত্মক রোগ হতে পারে। পরে আমরা এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(iii) জলে উপস্থিত নানা ধাতব যৌগ থেকে চর্মরোগ ও পেটের অসুখ হতে পারে।

(iv) জলশোধনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিকের অপরিমিত ব্যবহার এবং জল থেকে সেগুলি পৃথকীকরণ না করতে পারার ফলে জল দূষিত হয়। যেমন ক্লোরিন, ফ্লুরিন ঘটিত যৌগ মিশ্রিত পরিশোধক। এই ধরনের দূষিত জল ব্যবহার করার ফলে চর্মরোগ থেকে শুরু করে যকৃৎ ফুসফুস বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা বা প্যারালিসিস এবং হাড়ের গঠনে বিকৃতি ঘটতে পারে। বিশেষতঃ মায়ের শরীরে দূষণের সংক্রমণ ঘটার ফলে তার শিশু বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।

রোগ	সংক্রামণ স্থান	বাহক জীবাণু	জলে উপস্থিতির কারণ	রোগের উপসর্গ
১) অ্যামিবিয়াসিস্	হাত থেকে মুখ পর্যন্ত	প্রোটোজোয়া	অপরিশোধিত পানীয় জল, খাল বা নদীনালা, বদ্ধ জলে মাছির বসবাস	তলপেটে ব্যাথা, ক্লান্তি, ওজন কমে যাওয়া, বার বার বমি-পায়খানা, গ্যাসের ব্যাথা, জ্বরভাব
২) জিয়াডিয়া	,,	,,	অপরিশোধিত জলের সংস্পর্শ, জীবাণু নাশক ব্যবহার না করা, ভাঙ্গা পাইপের ফুটোর মধ্য দিয়ে দূষিত ভৌমজলের প্রবেশ, মানুষ ও জীবজন্তুর একই উৎস থেকে জল খাওয়া বা স্নান।	ডায়রিয়া, তলপেটে অস্বস্তি, গ্যাসের উপদ্রব।

রোগ	সংক্রামণ স্থান	বাহক জীবাণু	জলে উপস্থিতির কারণ	রোগের উপসর্গ
৩) ক্রিপ্টোস্পোরি-ডিওসিস্	মুখ ও গলা	,,	ফিল্টারের জালি বা ভেতরের পাত্রটি জীবাণুমুক্ত না করার ফলে সেখানে এই প্রোটোজোয়া জন্ম নেয়, অন্য জীবজন্তুর শরীর ও বর্জ্য থেকে এবং বৃষ্টিধোয়া জল থেকে খাল বিল ইত্যাদিতে গিয়ে মেশে।	ফ্লু, বারবার বমি ও পাতলা পায়খানা, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, হজম শক্তি নষ্ট হওয়া, স্টমাকের বৃদ্ধি, গ্যাস হবার প্রবণতা।
৪) স্কিস্টোসোমি-য়াসিস্	মুখ	প্যারাসাইট	প্রবাহমান দূষিত জলে আঁশ শামুকের খোল ইত্যাদিতে এই প্রকার প্যারাসাইট্ অবস্থান করে।	গায়ের চামড়ায় জ্বালা, চুলকানি, জ্বর ভাব, সর্দি-কাশি এবং পেশিসঞ্চালনে সমস্যা
৫) ম্যালেরিয়া	রক্ত	প্রোটোজোয়া	স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা এই রোগ বহন করে। খোলা জায়গায় পরিস্কার জলে এই মশা প্রচুর ভাবে বংশবিস্তার করে।	কাঁপুনি দিয়ে দ্রুত জ্বর আসা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়া, দুর্বলতা ওজন হ্রাস।

আর্সেনিক দূষণ ঃ

অতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে জলে সৃষ্ট দূষণকে আর্সেনিক দূষণ বলে।

আর্সেনিক একটি অধাতব মৌল যা ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরী করে যেমন আর্সিনেট্স, আর্সিন গ্যাস, আর্সিনাইটস্, আর্সেন অক্সাইড ইত্যাদি যা জলে বা মাটিতে উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে দূষিত করে।

আর্সেনিক ব্যবহার — আর্সেনিক ঘটিত যৌগগুলি বিষাক্ত ও ক্ষতিকর হলেও তা বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন—

(১) কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক হিসাবে, (২) রঙ, ওষুধ, সাবান, ব্যাটারী ইত্যাদি নির্মাণে এবং ইলেকট্রনিক শিল্পে, (৩) কাঠকে পচন এবং কীটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক উপাদান হিসাবে, (৪) গবাদি পশুর দেহে কীট ইত্যাদির সংক্রমণ রোধ করার জন্য।

সাম্প্রতিক কালে মাটিতে গভীর নলকূপ খোঁড়ার ব্যপকতার জন্য মাটির গভীর স্তরে অবস্থিত আর্সেনিক বিষাক্ত যৌগে পরিণত হয়ে পানীয় জলে মিশে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, চীন, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের মাটির গভীর স্তরে আর্সেনিকের অস্তিত্ব আছে। নলকূপ খোঁড়ার ফলে ঐ আর্সেনিকের সাথে জল, বায়ুর অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে এক বিষাক্ত জলে দ্রাব্য পদার্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি।

আর্সেনিক দূষণের ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর শরীরে নানান মারাত্মক ব্যধির সৃষ্টি হয় যেমন— আর্সেনিক দূষণের ফলে মানবদেহে সৃষ্ট রোগকে আর্সেনিকোসিস্ বলে। এর উপসর্গগুলি হলো —

(১) চামড়া, নখ, চুলে আর্সেনিক জমে হাতে পায়ে কালো দাগ, অ্যালার্জি, ফুসকুড়ি, চুলকানি হয়। নখে সাদা খাঁজ সৃষ্টি হয়।

(২) গায়ে এবং মুখে নীলচে ছোপ দেখা যায়। পায়ে কালো রঙের ঘা তৈরী হয়।

(৩) ফুসফুসের রোগ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস হয়।

(৪) যকৃত ও মুত্রনালীতে রোগ দেখা দেয়।

উদ্ভিদের কোষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

জীবজন্তুর দেহে আর্সেনিকের প্রভাবে চর্মরোগ, যকৃত বা ফুসফুসের রোগ হয়।

সার্বিক আর্সেনিক দূষণের ফলে মাটি, ভৌমজলস্তর এবং বায়ু দূষিত হয়।

সামুদ্রিক দূষণ ঃ

যেহেতু পৃথিবীর মোট উপরিতলের দুই-তৃতীয়াংশ জলভাগ যা প্রধানতঃ সমুদ্র ও মহাসমুদ্র তাই সামুদ্রিক পরিবেশের দূষণ সমস্ত পৃথিবীর পরিবেশের দূষণের মধ্যে অন্যতম প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। বনাঞ্চলের মতোই সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতা এবং বিভিন্ন অংশে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে গভীর এক নিজস্ব জগৎ আছে যা বাস্তুতন্ত্রের খুবই উন্নত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে বাঁধা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব গভীর সমুদ্রের এই বস্তুজগতের উপর সামান্যই। কেবলমাত্র সামুদ্রিক ভূমি তলের বিভিন্ন স্তরের সরণের কারণে সুনামী প্রভৃতি কিছু বিপর্যয় ছাড়া এই জগত প্রকৃতির দ্বারা সর্বদা সুরক্ষিত। কিন্তু মানুষের স্বার্থসিদ্ধির লোভ, অপরিণামদর্শিতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ-যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এবং সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্ব আজ প্রবল সংকটময়।

বিভিন্ন বিষাক্ত টক্সিনজাতীয় পদার্থ নানা রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের ক্ষুদ্র কণার সাথে যুক্ত হয়ে জলে মিশে দূষণ ঘটায়। এই পদার্থগুলি নানা প্ল্যাংক্টনজাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা এবং বেনথোস্ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর দ্বারা। অতঃপর সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে ঐসব দূষণ অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের শরীরে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে সামুদ্রিক জীবদের দেহ থেকে ঐ টক্সিন অন্যসব জীবের দেহেও প্রবেশ করে যারা খাদ্য হিসাবে মাছ বা মাছের তেল বা মাছ খাওয়া কোন জীবের মাংস খেয়ে থাকে। স্বাভাবিক ভাবে ঐ বিষ অত্যন্ত দ্রুত পরম্পরায় আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার কোনও বস্তুতে সঞ্চারিত হয় যথা— মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাখন ইত্যাদি।

সমুদ্রে দূষণ প্রবেশের সবচেয়ে সহজ পথ হলো নদী বাহিত আবর্জনা। যেমন আটলান্টিক সিটির নিকটবর্তী সমুদ্রে হাডস্‌ন নদী বাহিত পারদের অতিরিক্ত পরিমাণ উপস্থিতি এবং কোপেপড্ নামক প্লাংকটন দ্বারা তার শোষনের ফলে ঐ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রে পারদ দূষণের অনুপ্রবেশ ঘটে। দূষিত জলের মধ্যে অবস্থানকারী জলজ উদ্ভিদের শরীরে নানান বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয় যেমন, ন্যাপথলিন, ফেনানথ্রিন, বেঞ্জাপাইরিন ইত্যাদি।

অধিকাংশ দূষক যৌগগুলি অতিরিক্ত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নিষ্ক্রিয় বা নির্বিষ যৌগে পরিণত হয়। তাই জলে অক্সিজেনের প্রবাহ দ্বারা জলের বহু দূষণ শোধন করা হয়।

সামুদ্রিক দূষণের মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক হলো যুদ্ধবিগ্রহ, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ইত্যাদির দ্বারা বা ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে সমুদ্র তলে ভাসমান তেলের আস্তরণ সৃষ্টি। এই আস্তরণের ফলে সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাবে মারা যায় এছাড়াও তা সমুদ্রের বাস্তুকে নষ্ট করে। মাছের উৎপাদন কমে যায়। প্রোটোজোয়া, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আবার ঐ দূষিত জলের মাছ বা পোকামাকড় খেয়ে সামুদ্রিক পাখিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঐ তেল পাখির ডানায় লেগে জড়িয়ে গিয়ে এক তৈলাক্ত ভারী আস্তরণ তৈরী করে ফলে পালকের জল কেটে বেরিয়ে যাওয়া এবং জলের উপস্থিতিতেও দেহকে উষ্ম রাখার ক্ষমতা নষ্ট হয়। এই রোগকে 'থাইপোথারমিয়া' বলা হয়। ফলতঃ তৈলস্তরের সংস্পর্শে আসা হাজার হাজার পাখি মারা যায়।

3.3.4 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণে উপায়

জলদূষণের উৎস ও বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাবগুলি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে জেনেছি। এখানে আমরা জলদূষণ প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ — জলদূষণ প্রতিরোধে প্রকার কর্তব্য হলো জলে দূষণের অনুপ্রবেশকে বন্ধ করা ও পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বনে দূষণের নিয়ন্ত্রণ। জল দূষণ নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় হলো —

(১) জলের প্রধান প্রধান আধার অর্থাৎ নদী, পুকুর, খাল-বিল, হ্রদ এবং সমুদ্রে সরাসরি আবর্জনা বা শিল্পে ব্যবহৃত জল ফেলা বন্ধ করা।

(২) কোনও নদী, পুকুর বা সমুদ্রে জল ফেলার আগে জলকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিশোধিত করা।

(৩) পুকুর বা নদীর পাড়ে জামাকাপড় বা বাসনপত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোয়া এবং গবাদী পশুর স্নান করানো বন্ধ করা।

(৪) চাষ আবাদের কাজে অতিরিক্ত পরিমাণ সার ও কীটনাশক পদার্থের প্রয়োগ বন্ধ করা।

(৫) সমুদ্রের জলে তেল ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা।

(৬) আবর্জনা দিয়ে পুকুর বা জলাশয় ভরাট করা এবং এইভাবে বসবাসযোগ্য পৌর এলাকা বা শিল্পাঞ্চলের জন্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

(৭) পরিবেশ বিদ্যা, দূষণের প্রকৃতি ও প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৮) জলদূষণ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন ও তার সঠিক প্রয়োগে দূষণ রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া জলদূষণ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রথম ১৯৭৪ সালে প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রন আইন প্রণয়ন হয় যা ১৯৭৮ সালে সংশোধিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালে জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সেস্ আইন প্রণয়ণ করা হয়। যদিও সাধারণ লোকের মধ্যে এই আইনের ধারা এবং তার প্রয়োগ বিষয়ে সচেতনতার অভাব আছে।

জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো —

(i) জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

(ii) জলের গুণগত মান বজায় রাখা।

(iii) জলদূষণ আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে পূর্ণ অধিকার দান।

বর্জ্য জলের শোধন ও দূষণ দূরীকরণ ঃ শিল্প ও পৌর কার্যে ব্যবহৃত বর্জ্য জলের পরিশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হলো—

(i) ভাসমান কঠিন পদার্থ (ভৌত, রাসায়নিক, জৈব) দূরীকরণ এর জন্য অধঃক্ষেপন, পরিস্রাবন, অভিস্রাবণ, ভাসন, পাতন ইত্যাদি ভৌত পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

(ii) জৈব ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ দূরীকরণ-এর জন্যও বিশেষ জৈব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

(iii) বিভিন্ন জৈব বা অজৈব পদার্থ যেমন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদির যৌগ ঘটিত দূষণ, যা সহজ পদ্ধতিগুলির সাহায্যে দূর করা যায় না তার জন্য রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ। প্রধানতঃ এক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ-বিজারণ পদ্ধতি ও রাসায়নিক সংশ্লেষের ব্যবহার করা হয়।

দূষিত জল পরিশোধন পদ্ধতি ঃ জাতীয় ও রাজ্য পরিবেশনীতি অনুসারে জলদূষণের মান নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাই শিল্প কারখানা ও পৌর এলাকায় ব্যবহৃত জল পরিশোধন না করে কোনও জলাধারে যেমন পুকুর, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিতে ফেলা পরিবেশ বিরুদ্ধ কাজ। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য জল এবং পৌর এলাকায় ব্যবহৃত জল বিভিন্ন পদ্ধতি পরিশোধন করা প্রয়োজন। দূষিত জল পরিশোধনের কয়েকটি পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হলো।

পরিস্রাবণ— এই পদ্ধতি জলে ভাসমান (অদ্রাব্য) কঠিন কণাজাতীয় দূষণ দূর করা হয়। দূষিত জলকে প্রবাহিত

করা হয় বিভিন্ন তারজালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। প্রথমে বড়ো আকারের ছিদ্রযুক্ত জালি ও পরে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিদ্রযুক্ত জালির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করার ফলে বিভিন্ন আকারের দূষিত কঠিন ভাসমান কণা পৃথক করা হয়।

অধঃক্ষেপণ — জলে ভাসমান সূক্ষ্ম আকারের কঠিন কণাজাতীয় দূষণ দূর করার জন্য দূষিত জলকে একটি বৃহৎ জলাধারের মধ্যে দিয়ে খুবই ধীর গতিতে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে কঠিন কণাজাতীয় দূষণ জলাধারের তলায় অধঃক্ষিপ্ত হয়।

ট্রিকলিং ফিলটার— এটি দ্রাব্য বা অদ্রাব্য জৈব দূষক দূরীকরণের এক পুরাতন এবং উপযোগী পদ্ধতি। এখানে একটি দীর্ঘ চোঙাকৃতি পাত্রে অজস্র নুড়িপাথরের স্তরের মধ্যে দিয়ে জলকে উপর থেকে নীচে প্রবাহিত করা হয়। নুড়ির মধ্যে দিয়ে বায়ুচলাচলের জন্য উপর ও নীচের স্তরে তাপমাত্রায় যথেষ্ট ফারাক সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। ফলতঃ নুড়িগুলির উপরে জৈব স্তর গঠন হয় যা অত্যন্ত ঘন হলে তাকে পৃথক করে নেওয়া হয়। স্তরটি মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার পর জল অন্য একটি জলাধার সঞ্চয় করা হয়।

নুড়িগুলির উপর সঞ্চিত জৈব স্তরের মধ্যে থাকা ছত্রাক, শৈবাল, ভূমি প্রভৃতি প্রাণী জলে উপস্থিত জৈব দূষণকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জলকে বিশুদ্ধ করে।

সক্রিয় গাদ পদ্ধতি— এই পদ্ধতিতে বর্জ্য জলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণুকণার উপস্থিতি বায়ুর বুদবুদের স্রোত প্রবাহিত করা হয়। ফলে জীবাণুদের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ গঠিত হয়। ঐ সব জীবাণু জলে উপস্থিত জৈব দূষণকে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এইভাবে জৈবক্ষয়ের মাধ্যমে জলের জৈবদূষক পদার্থ দূর করে এবং উপজাত পদার্থরূপে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

জারণ— জলে উপস্থিত বেশ কিছু অধাতব যৌগ যেমন নাইট্রোজেন বা ফসফরাস যৌগকে যার অধিকাংশ বিষাক্ত দূষক পদার্থ তা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারণ পদ্ধতি দূর করা হয়। প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য নিয়ন্ত্রিত উপায়ে বায়ু সঞ্চালন করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে বিষাক্ত দূষক পদার্থকে অদ্রাব্য অধঃক্ষেপ পরিণত করে পৃথক করা হয় অথবা এমন কোন দ্রাব্য পদার্থে পরিণত করা হয়।

এছাড়া শিল্পক্ষেত্রের বর্জ্য জলে নানা অম্ল বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ থাকে। ঐ ধরনের বর্জ্য জলমুক্ত পরিবেশে উন্মুক্ত করার আগে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশমন করা উচিত।

পানীয় জলের গুণ মান নির্ণয় ঃ নির্ধারিত জাতীয় মাত্রা

জলের বৈশিষ্ট্য / দ্রবীভূত পদার্থ	ISI বা ভারতীয় জাতীয় মান অনুসারে সর্বোচ্চ অনুমোদন যোগ্য দূষণের সীমা
(১) ক্ষারতা (pH মাত্রা)	5·0 – 9·2
(২) দ্রাব্য অক্সিজেন (DO)	3·0 ppm
(৩) ক্লোরাইড যৌগ	1000 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে
(৪) সালফেট যৌগ	400 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে
(৫) সায়ানাইড যৌগ	0·05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে
(৬) আর্সেনিক যৌগ	0·05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে
(৭) লেড যৌগ	0·05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে
(৮) ক্রোমিয়াম যৌগ	0·05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে
(৯) ফ্লুওরাইড যৌগ	1·50 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে

লোকালয়ের পানীয় জলের প্রধান উৎসগুলি এই দূষণ সীমা যাতে অতিক্রম করে না যায় সেদিকে জনসাধারণ ও প্রশাসন সবারই খেয়াল রাখা উচিত। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার উন্মুক্ত ক্ষুদ্র জলাশয় যেমন পুকুর, কূয়া, নলকূপ ইত্যাদি শোধন করানো প্রয়োজন।

পানীয় জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি ঃ সাধারণ ফিলটার ব্যবহার করে শুধুমাত্র ভারী অদ্রাব্য বস্তুকণা ও কঠিন পদার্থ ছাড়া অন্য কোন দূষণ পরিশোধন করা সম্ভব নয়। অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবহার এবং অক্সিজেন কণার পরিচলনের দ্বারা শোধন করা জল অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপদ। সব থেকে ভালো হলো পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া।

(১) পানীয় জল 10–20 মিনিট ফুটিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে খাওয়া উচিত। এছাড়া পানীয় জল পরিশোধনের জন্য লিটার প্রতি ১টা করে হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিয়ে আধঘণ্টা পর সেই জল পান করা যায়। জল রাখার এবং খাবার বাসনপত্র জীবাণুমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। স্যাঁতসেতে বা নোংরা জায়গায় খাবার জল খোলা রাখা উচিত নয়।

(২) পাতকুয়ো পরিশোধনের জন্য ৩০০ — ৫০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার ঢেলে তার কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা পর সেই পাতকুয়ো থেকে উপরের বেশ কিছুটা জল প্রথমে ফেলে দিয়ে বাকি জল প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাবে।

(৩) গভীর নলকূপ বা টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে তার সাথে যুক্ত পাম্প মেশিনটি প্রথমে খুলে নিয়ে নলের মধ্যে ৩—৪ চামচ ব্লিচিং পাউডার ঢেলে যন্ত্রটি আবার আগের মতো লাগিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রেও কমপক্ষে বারো ঘণ্টা পর প্রথমে উপরিতলে বেশ কিছুটা জল বের করে ফেলে দিয়ে তারপর বাকি জল ব্যবহার করা যাবে।

3.4 ভূমিদূষণ (Land pollution)

ভূপৃষ্ঠের তিনের-এক ভাগেরও কম (প্রায় 29%) অংশ নিয়ে স্থলভাগ গঠিত। এই স্থলভাগের উপরেই মানুষ ও অন্যান্য স্থলবাসী জীবের বাসস্থান। ভূমির গুণগত মানের ওপর এদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। মানুষের বেশির ভাগ কাজকর্ম, যেমন— কৃষি, খনন, শিল্প প্রভৃতি ভূমি কেন্দ্রিক, সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ ভূমির ওপর আঘাত হেনেছে। মানুষের প্রয়োজনে অনেক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে; অনেক জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে; এবং ভূ-সম্পদের যথেষ্ট অবনমন বা ক্ষতি ঘটেছে। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আজকের দিনে ভূমির অবনমন বা ভূমি দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্ভাবনার বিষয়।

যদিও পৃথিবীতে সামগ্রিক ভাবে কর্ষিত জমির পরিমাণ বেশ কম, দক্ষিণ এশিয়ায় এর শতকরা পরিমাণ (45%) পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ যুক্তরাজ্য (25%), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (21%), জার্মানী (35%), ফ্রান্স (35%) এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে এই হার মাঝারি। আবার সাহারাবর্তী (Sub-Saharan) আফ্রিকা (7%) ও অস্ট্রেলিয়ার (6%) মোট জমির খুব সামান্য অংশই কৃষিজমি।

সারণি ঃ ভূ-পৃষ্ঠে জমি বণ্টনের প্রকৃতি (বিলিয়ন হেক্টর এককে, 1 বিলিয়ন = 100 কোটি)

ভূপৃষ্ঠের মোট জমি	কৃষিযোগ্য জমি	স্থায়ী তৃণভূমি ও পশুচারণ ভূমি	বনাঞ্চল বৃক্ষভূমি	অন্যান্য জমি (নিষ্ফলা ও অকৃষি যোগ্য জমি)
13·00	1·44	3·66	3·89	4·31
(100%)	(11%)	(26%)	(30%)	(33%)

একথা সহজেই বোঝা যায় যে পৃথিবীর মোট জমির পরিমাণ স্থির (fixed) এবং অফুরন্ত (inexhaustible) নয়।

ভূমি প্রকৃতিরই অঙ্গ; এর যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে ভূমি ক্ষয় ও দূষণ সংঘটিত হচ্ছে। ভূমিতে খাদ্য উৎপাদিত হয়, গড়ে ওঠে আশ্রয় স্থল— এমনকি ভোগ্য পণ্যের যোগানের জন্যও মানুষ ভূমির উপর নির্ভর করে। মানুষ ভূমিকে প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষা ভোগ্যবস্তুর যোগানদার হিসাবে বেশি ভেবেছে। তাই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি (natural systems) মানুষের লোভজনিত অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভূমিকে কোন রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই ভূমিক্ষয় ও ভূমি দূষণ হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমিকে দূষিত হতে না দেওয়া।

3.4.1 মৃত্তিকা (Soil)

ভূ-তলের পাতলা আবরণ মৃত্তিকা (আপেলের খোসার মত পাতলা মাত্র 30 – 40 মিটার পুরু) জীবজগতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা জল ধরে রাখতে পারে এবং উদ্ভিদ ও অসংখ্য অনুজীবের (microorganisms) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বেশিরভাগ উদ্ভিদ তাদের বেঁচে থাকার জন্য মাটি থেকে পুষ্টি পদার্থ সংগ্রহ করে। কাজেই পরিবেশগত ভাবে মৃত্তিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শিলার আবহবিকারের (Climatic erosion) ফলে উৎপন্ন রেগোলিথ (regolith) -এর ওপর জলবায়ু, উদ্ভিদ, ভূ-সংস্থান ইত্যাদির অন্তক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকার উদ্ভব ঘটে। মৃত্তিকার তিনটি স্বতন্ত্র অনুভূমিক (horizontal) তল দেখা যায় যথাক্রমে A, B ও C অনুভূমিক তল। এদের মধ্যে সবচেয়ে ওপরের A স্তর থেকে ধৌত-প্রক্রিয়ায় (leaching) পদার্থের অপসারণ মধ্যবর্তী B স্তরে A স্তর থেকে চুঁইয়ে আসা পদার্থের সঞ্চয় এবং সবচেয়ে নিচের C স্তরটিতে আদি শিলা (parent rock) দেখা যায়। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন উর্বরতা মান, বিশেষ ধরনের জলবায়ুগত ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কিত পরিবেশে ধৌত-প্রক্রিয়ায় অপসারিত এবং সঞ্চিত পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।

সকল কৃষিকাজের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতামান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অত্যাধিক ব্যবহার ও অবিবেচনাপ্রসূত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনের জন্য মৃত্তিকার মানের অবনমন ঘটে। প্রতিবছর শত শত কোটি টন উপরি মৃত্তিকা (top soil) অপসারণের ফলে ভূমির ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, যা কৃষিকাজের পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয়।

3.4.2 মৃত্তিকার অবনমণের কারণ ও তার প্রতিকার (Cause of Soil degradation and its prevention)

মৃত্তিকার অবনমণ বা ভূমি দূষণের তিনটি প্রধান কারণ হল —

(i) ভূমিক্ষয়, (ii) জমিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এবং (iii) ভূমিতে লবণাত্মক জলের অধিক্য।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান কারণ ছাড়াও ভূমি দূষণের আর একটি অন্যতম কারণ হল বর্জ্য পদার্থের অধিক্য।

(i) **ভূমিক্ষয় (Soil erosion)** ঃ ভূমির উপরিভাগের মৃত্তিকার এক স্থান থেকে অপর স্থানে পরিবাহিত (transportation) হওয়ার ঘটনাকে ভূমিক্ষয় বলা হয়। যদিও ইহা একটি বায়ু ও জল প্রবাহ জনিত প্রাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু ইহা অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত হয় মানব সমাজের বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য। যেমন— চাষ আবাদ, নির্মাণ কার্য, অরণ্যছেদন, অবাধ গবাদি পশুচারণ এবং জমির উপরিভাগের তৃণরাজি পোড়ানো (burning of grass cover)।

ভূমিক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা ও জলধারন ক্ষমতা কমে যায়। মৃত্তিকার উপরিভাগের ক্ষয় জলাভূমিকে ভরাট করে এছাড়াও জলকে ঘোলাটে করে দূষিত করে, ফলে জলজ জীবকুলের জীবন বিপন্ন হয়।

প্রাকৃতিক ভাবে 1 ইঞ্চি (2·5 সে.মি.) মৃত্তিকা তৈরী হতে সাধারণ ভাবে 200 – 1000 বছর সময় লাগে। কিন্তু ভূমিক্ষয় যদি ভূমি গঠন অপেক্ষা দ্রুততর হতে থাকে তাহলে ইহা একটি প্রাকৃতিক সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে পরিগণিত হবে। যা সুদূর ভবিষ্যতে মানব সমাজের কাছে এক বিপদবার্তা বহন করবে।

এই ভূমিক্ষয় রোধের অন্যতম প্রধান উপায় হল-বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ভূমির সংরক্ষণ এবং ব্যবহার।

ভূমি সংরক্ষণ সাধারণত প্রধান দুটি প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে।

(a) এলাকা ভিত্তিক ভূমি সুরক্ষা (Area treatment which involves treating the land)

(b) প্রণালী গঠনের মাধ্যমে ভূমি সুরক্ষা (Drainage-line treatment, which involves treating the natural water courses)

(a) এলাকাভিত্তিক ভূমি সুরক্ষা (Area treatment, which involves treating the land)

উদ্দেশ্য (Purpose)	প্রক্রিয়া (Treatment measure)	ফলাফল (Effect)
(1) বৃষ্টিপাতজনিত ক্ষয় রোধ।	অনাবাদি জমিতে বৃক্ষরোপণ	মৃত্তিকার অপসারণ হ্রাস।
(2) মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।	জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন খাল ও নালা তৈরী এবং বাঁধ দেওয়া।	ভূমির আদ্রতা বৃদ্ধি।
(3) মৃত্তিকার নূন্যতম অপসারণ।	পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করে বৃষ্টিপাতের অতিরিক্ত জল সঞ্চয় করা।	মৃত্তিকার আদ্রতা বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভে কৈশিক জলের বৃদ্ধি।
(4) ভূমিতে ধাপে ধাপে উপত্যকার সৃষ্টি।	বৃষ্টিপাত বা জল প্রবাহের ফলে ভূমির উপরি স্তরের মাটি যাতে সরাসরি বাহিত না হয়ে ধাপে, ধাপে বাহিত হয়।	এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে ভূমির ধস রোধ করা যায় এবং ভূমির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(b) প্রণালী গঠনের মাধ্যমে ভূমি সুরক্ষা (Drainage-line treatment)

উদ্দেশ্য (Purpose)	প্রক্রিয়া (Treatment measure)	ফলাফল (Effect)
(1) ভূমির ধস ও পলিমাটির অপসারণ রোধ।	উৎপত্তি স্থলেই ধস রোধ করা।	ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
(2) জল প্রবাহের গতিহ্রাস ও উপরি-ভাগের স্বচ্ছ জলের অধোগমণ করানো।	নালাগুলিতে ছোট ছোট বাঁধ তৈরী।	জলপ্রবাহের গতি হ্রাস এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি।

(ii) জমিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার (Excess use of fertilizers and pesticides) ঃ

পৃথিবীতে প্রায় 25% শস্য উৎপাদনে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। গতকয়েক দশক ধরে রাসায়নিক সারের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে এবং শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনস্বীকার্য। রাসায়নিক সার থেকে প্রাপ্ত তিনটি প্রধান উপাদান পটাশিয়াম, ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন যৌগ মাটির পুষ্টি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কিন্তু রাসায়নিক সারের অধিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে কৃষিজমির নিজস্ব উর্বর ক্ষমতা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে যা ভূমি দূষণের কারণ।

এছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হল রাসায়নিক সারে সাথে অধিক মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহার।

কীটনাশক ব্যবহারের সমস্যা (Problems with pesticide use) ঃ

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত ছত্রাক, কীটপতঙ্গ ও আগাছা ধ্বংস করা হয় তাকে কীটনাশক বলে।

কীটনাশককে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন— পতঙ্গনাশক (insecticides), ছত্রাক নাশক (fungicides) ইঁদুর নাশক (rodenticides) এবং আগাছা নাশক (herbicides)।

কীটনাশক শুধু অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গের ক্ষতিকরে না, বৃহত্তর জীব সমাজ (মানব সমাজ) এবং জীব চক্রেরও ক্ষতি করে।

স্থায়ীত্বের দিক দিয়ে কীটনাশক দুই প্রকার — ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী।

ক্ষণস্থায়ী কীটনাশকের কার্যক্ষমতা সাময়িক এবং এর ক্ষমতাও স্বল্প। ফলে ইহা তাৎক্ষণিক অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ নাশে সহায়তা করে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলে না, ফলে ভূমি দূষণে এর ভূমিকা স্বল্প।

দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক যেমন DDT, সহজে নষ্ট হয় না। ইহা ব্যবহারের ফলে জমিতে এবং জীবদেহে দীর্ঘদিন সঞ্চিত হয়ে থাকে। DDT মূলত মশা নাশক। ব্যবহারের প্রথম দশকে (1942 – 1952) মশাবাহিত রোগের প্রকোপ থেকে প্রায় 50 লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছে। কিন্তু কিছু সময় ব্যবহারের ফলে মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের শরীরে DDT-এর বিরুধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে (immuned)। ফলে ইহা কীটনাশক রূপে কার্যকর হয় না কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব ভূমি অর্থাৎ পরিবেশে এবং মানব দেহে দেখা যায়। কীটপতঙ্গ নাশে ব্যবহৃত এই দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকগুলি ভূমির মধ্যে থেকে যায় এবং মৃত্তিকা কণার সঙ্গে মিশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয়। যার ফলে বিস্তৃত এলাকার মাটি দূষিত হয়।

কীটনাশক ব্যবহারের আর একটি ক্ষতিকর দিক হল অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ নাশের সাথে সাথে অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে। কীটনাশক ব্যবহারকারী এবং কীটনাশক ব্যবহৃত শস্য গ্রহণকারী উভয়ের কীটনাশকের প্রভাবে স্বাস্থ্য হানি ঘটে। দীর্ঘ দিন ধরে স্বল্প পরিমাণ কীটনাশকের ব্যবহারেও ক্যানসার (cancer) এর মতো মারণ রোগও হতে পারে।

এর ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ কৃষক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে অন্যান্য উপায়ে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। যেমন প্রথাগত চাষের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী কৃষিজ উৎপাদন (Sustainable agriculture), জৈবিক কৃষি (Organic agriculture), পরিবর্তন কৃষি (alternative methods) ইত্যাদি।

দীর্ঘস্থায়ী কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র (eco-system) বজায় রেখে অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকরী যথার্থ সুরক্ষিত খাদ্য উৎপন্ন করা হয়।

জৈবিক কৃষি পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব সার (যেমন শস্যের পাতা, মূল) এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় এবং ভূগর্ভস্থ জৈবিক পদার্থও বৃদ্ধি পায়।

পরিবর্ত শস্য কর্ষণের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমিক্ষয় রোধও করা যায়।

কৃষিজ জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে উপরোক্ত পরিবর্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূমির দূষণ রোধ এবং উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(iii) **ভূমিতে লবণাত্মক জলের আধিক্য (Excess saline water in soil) ঃ**

বৃষ্টির জল ব্যবহারের পরিবর্তে আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে শস্য উৎপাদন হয়। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহারে কিছু ক্ষতিকর দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। এই জলে লবণের আধিক্য দেখা যায়। ফলস্বরূপ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ভূমির উপরিভাগের জল বাষ্পায়িত হয়ে গেলে ভূমির উপরিভাগে লবণের আধিক্য দেখা যায়।

যা থেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং শস্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। একই জমিতে দীর্ঘদিন ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহারের ফলে ভূমি লবণাত্মক ও অনুর্বর হয়ে ওঠে।

এরকম ভূমিদূষণ থেকে ভূমিকে রক্ষা করার জন্য প্রথাগত চাষের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী কৃষিজ পদ্ধতিতে চাষআবাদ করতে হবে।

3.4.3 বর্জ্য পদার্থজনিত দূষণ (Pollution due to waste matter)

বর্তমান সভ্যতার অন্যতম সমস্যা হল বিভিন্ন কল-কারখানা, শিল্পাঞ্চল ও গৃহস্থলীর উচ্ছিষ্ট বর্জ্য পদার্থ। এই বর্জ্যপদার্থের সর্বশেষ গন্তব্য হল মৃত্তিকা। বিভিন্ন রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থের মিশ্রণে সৃষ্ট এই বর্জ্য পদার্থ ভূমিকে বিষাক্ত ও দুষিত করে তুলছে। বেশির ভাগ বর্জ্য পদার্থ পচনক্ষম বা দহন যোগ্য নয়, ফলে বছরের পর বছর মাটির মধ্যে থেকে ইহা ভূমির সাথে সাথে পরিবেশকেও দূষিত করছে।

এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য বর্তমানে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা (Waste Treatment)

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ বর্জ্য পদার্থের নানাভাবে অপসারণের পন্থা উদ্ভাবন করছে। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ মাটিতে ফেলে রাখা হয় পচনের জন্য বা গোবর ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো হয়।

শহরাঞ্চলে গৃহস্থলীর বর্জ্য পদার্থের মধ্যে পচনশীল জৈব আবর্জনা ছাড়াও উত্তরোত্তর প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্জ্যপদার্থ হিসাবে প্লাস্টিক, নানারকম রাসায়নিক যৌগ বর্জ্য পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়। এর প্রতিকার হিসাবে জনসচেতনতা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে যে এই আবর্জনা যত্র তত্র না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় যেন ফেলা হয়। এরপর সংগৃহীত আবর্জনা থেকে পচনশীল জৈব পদার্থ ও কঠিন অপচনশীল রাসায়নিক পদার্থ (non-degradable solid chemical matter) আলাদা করে তা পুণব্যবহারের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বড় শহরগুলিতে উদ্বৃত্ত বিশাল আবর্জনা ফেলার মত স্থান দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে এবং এত বিশাল পরিমাণ আবর্জনার ব্যবস্থাপন এক বিরাট সমস্যা। বর্তমানে এই আবর্জনাকে কাজে লাগানোর বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে এবং তার অপসারণের নানা দিক ভেবে তা কাজে লাগানো হচ্ছে।

এই কঠিন বর্জ্য পদার্থের অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন— আবর্জনা সৃষ্টি হ্রাস, পুনর্ব্যবহার, জৈব সার উৎপাদন ও ভস্মীভূত করা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্জ্যপদার্থ জনিত দূষণ থেকে ভূমিকে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোথাও কোথাও এই বর্জ্য থেকে শক্তির উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

সর্বোপরি, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য দরকার বর্তমান মানব সমাজের সচেতনতা ও সুষ্ঠ পরিকল্পিত প্রশাসনিক চেষ্টা, যার দ্বারা আমাদের ধারণ ও লালন পালন করছে যে ধরিত্রী মাতা (ভূমি), তার সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা সম্ভব।

3.5 শব্দদূষণ (Noise pollution)

শব্দ প্রাণীজগতের অস্তিত্ব ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যম, শব্দ ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি না। পরস্পর যোগাযোগের ভাষা যুগিয়েছে শব্দ। শব্দহীন এই পৃথিবী আমরা কল্পনা করতে পারি না। শব্দ এক অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু বেসুরো, উচ্চগ্রামের একটানা শব্দ আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে, এক অস্বস্তি কর, যন্ত্রনাময় অবস্থার সৃষ্টি করে। শ্রোতার কাছে অনভিপ্রেত, অস্বস্তিকর বিরক্ত উৎপাদক শব্দকে কোলাহল বা শ্রুতিকটু কলরব (noise) বলা হয়।

কোনো অনাকাঙ্খিত শব্দ যদি আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়, শারীরিক বা মানসিকভাবে স্বাস্থ্যহানিকর হয় তবে শব্দ দূষণ হয়েছে বলা হয়। শব্দদূষণ শব্দশক্তির অপচয়ে হিসাবে গণ্য করা যায়।

সাধারণতঃ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং স্থিতিকাল বা পুনঃপুনঃ সংঘটনের উপর শব্দদূষণের মাত্রা নির্ভর করে। একটানা হাতুড়ি মারার শব্দ, মোটর গাড়ির এয়ার হর্ণ একটানা জোরে বাজানোর আওয়াজ, জলের পাম্প বা জেনারেটর চালানোর শব্দ এসব শব্দদূষণ ও যন্ত্রনাসৃষ্টির উদাহরণ।

শব্দদূষণ, জল, বায়ু দূষণের মত ক্ষতিকারক না হলেও, ইহা প্রকৃতি পরিবেশের গুণগত মানকে নিম্নমুখী করে।

শব্দের প্রাবল্যের মাত্রা 'ডেসিবেল' (decibel) একককে মাপা হয়। New Delhi-based National Physical Laboratory এর এক গবেষণায় দেখা গেছে শব্দদূষণ এর অন্যতম প্রধান কারণ পটকা বাজি ফাটানো যেখানে শব্দের মাত্রা (125°dB) নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে। Environment (Protection) (Second amendment) Rules, 1999-এর অনুমোদিত শব্দের প্রাবল্য মাত্রা হল 65 ডেসিবেল (dB)।

3.5.1 শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস (Different sources of noise pollution)

শব্দদূষণের বিভিন্ন উৎস সমূহকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় ঃ

(i) পরিবহন জনিত, (ii) শিল্পজাত ও (iii) গৃহাভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক কার্যকলাপ কৃত শব্দ দূষণ।

(i) **পরিবহণ (Transportation) জনিত শব্দদূষণ ঃ** ভূতল, বিমান ও রেলপথে পরিবহন সৃষ্ট শব্দ, শব্দদূষণের প্রধান কারণ।

বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির সাথে, সাথে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠেছে যানবাহনের নিরন্তর বৃদ্ধি।

এই যানবাহনের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত শব্দ, শব্দদূষণকে বর্ধিত করে চলছে।

শহরাঞ্চলে যানবাহনের আধিক্য বেশি হওয়ায়, এই অঞ্চলের মানুষেরা তাড়াতাড়ি শব্দদূষণে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

(ii) **শিল্পজাত (Industrial) শব্দদূষণ ঃ** বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত মেশিন চলবার শব্দ এবং এসব শিল্পে সংঘটিত নানাবিধ প্রক্রিয়া দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই ধরনের দূষণের শিকার কর্মরত শ্রমিকেরা এবং শিল্পসংলগ্ন এলাকার মানুষেরা।

(iii) **গৃহাভ্যন্তরীণ (Indoor) ও পারিপার্শ্বিক (Out door) শব্দদূষণ ঃ** ঘরের ভিতরে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম যেমন জেনারেটর, জলের পাম্প, ওয়াশিং মেশিনের একটানা আওয়াজ, টি. ভি, রেডিও, টেপ রেকর্ডারের উচ্চগ্রামে চালানোর শব্দ, পারিপার্শ্বিকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ আওয়াজ শব্দদূষণ সৃষ্টিকারক।

3.5.2 শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (Intensity)

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা প্রকাশ করা হয় 'বেল' বা 'ডেসিবেল' এককে (1 বেল = 10 ডেসিবেল)। দূরভাষের আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের নামানুসারে এই এককের নামকরণ। ডেসিবেলের সংজ্ঞা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় নীচের সমীকরণটির মাধ্যমে —

$$\text{ডেসিবেল (dB)} = 10 \log_{10} \frac{\text{নির্ণীত শব্দপ্রাবল্য (I)}}{\text{প্রামাণ্যের শব্দপ্রাবল্য } (I_0)}$$

কোনও বিশেষ শব্দের প্রাবল্য যদি প্রামাণ্য শব্দের প্রাবল্যের 10 গুণ হয় (অর্থাৎ $\frac{I}{I_\circ} = 10$) তবে ঐ বিশেষ

শব্দের প্রাবল্য মাত্রা 10 ডেসিবেল হবে (কারণ, $\log_{10} 10 = 1$ সুতরাং $10 \times \log_{10} 10 = 10 \times 1 = 10$)। আবার বিশেষ কোনো শব্দের প্রাবল্য প্রামাণ্য শব্দ প্রাবল্যের 100 গুণ হলে ঐ বিশেষ শব্দের শব্দ প্রাবল্যমাত্রা হবে 20 ডেসিবেল (কারণ $\log_{10} 100 = 2$ সুতরাং $10 \times \log_{10} 100 = 10 \times 2 = 20$)। অর্থাৎ 20 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যমাত্রা 10 ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্যমাত্রার দ্বিগুণ নয়, 10 গুণ। অনুরূপে 30 ডেসিবেলের শব্দ প্রাবল্যমাত্রা 20 ডেসিবেলের 10 গুণ, 40 ডেসিবেলের প্রাবল্যমাত্রা 30 ডেসিবেলের 10 গুণ— এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়বে।

মানুষের শ্রবণযন্ত্রের শব্দের তীব্রতা গ্রহণ করার সীমা যদিও খুব বিস্তৃত, তবু 70 ডেসিবেল থেকে বেশি তীব্র শব্দ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নানারকম শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হয়— বিশেষ করে অনির্দিষ্টকাল ধরে যদি তা চলতে থাকে।

সারণি ঃ শব্দ তীব্রতা, শব্দের উৎস এবং উচ্চমাত্রার শব্দের ক্ষতিকর প্রভাব।

ডেসিবেল মাত্রা	শব্দের উৎস ও তার ক্ষতিকর প্রভাব
0	মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দের নিম্নতম মাত্রা।
10	গাছের পাতা নড়ার শব্দ।
20	বেতার স্টুডিওর অভ্যন্তরের শব্দ।
30	পাঠাগারের অভ্যন্তরের শব্দ।
40	গৃহের অভ্যন্তরের শব্দ।
50	30 মিটার দূর থেকে শ্রুত হাল্কা যানবাহনের শব্দ।
60	সাধারণ কথাবার্তা।
70	রেডিও, লাউড স্পিকারের শব্দ, এই মাত্রা ক্ষতিকারক।
80	মোটর গাড়ির এয়ার হর্ণ।
90	পাতাল রেল যাওয়ার শব্দ। এই মাত্রা স্থায়ী ক্ষতিকারক।
100	ড্রিল মেশিনের শব্দ, অর্কেষ্ট্রার শব্দ। ইহা খুব ক্ষতিকর।
110	রক মিউজিকের শব্দ।
120	শক্তিশালী বাজি পটকার শব্দ।
146	বিমান ওঠা, নামার শব্দ। ইহা খুব যন্ত্রণা দায়ক।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা মহানগরীর বাস্তব অবস্থা নীচের সারণিতে দেখানো হল ঃ

সারণি ঃ কোনো নগরীতে নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা এবং কলকাতায় প্রকৃত শব্দ প্রাবল্যমাত্রা

বিশেষ এলাকা	নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)		কলকাতায় প্রকৃত শব্দ প্রাবল্য মাত্রা (ডেসিবেল)	
	দিনে	রাত্রে	দিনে	রাত্রে
(i) বসবাস এলাকা	55	45	79	65
(ii) নিঃশব্দ অঞ্চল (হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ এসবের 100 মিঃ দূরত্ব পর্যন্ত।	50	40	79	65
(iii) বাণিজ্য এলাকা	65	55	82	75
(iv) শিল্পাঞ্চল	75	65	78	67

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে শিল্পাঞ্চল ছাড়া কলকাতার শব্দ প্রাবল্য মাত্রা নিরাপদ সীমার বেশি। এখন থেকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সুদূর ভবিষ্যতে এর ফলে খুব মারাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে।

3.5.3 জনস্বাস্থ্যের উপর শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব

শব্দদূষণ আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার ক্ষতিই করতে পারে। সাধারণতঃ শব্দপ্রাবল্যমাত্রা এবং শব্দের স্থিতিকালের উপর ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্দেশিত শব্দের নিরাপদ প্রাবল্যমাত্রা হল 45 ডেসিবেল।

80 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দ আমাদের ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে, 85 ডেসিবেল আওয়াজের শব্দ আমাদের কানের ক্ষতি করতে শুরু করে। 88 ডেসিবেলের শব্দ একটানা হতে থাকলে আমাদের শ্রবণক্ষমতা কমে আসতে থাকে, 135 ডেসিবেলের আওয়াজ যন্ত্রনাদায়ক এবং 150 – 160 ডেসিবেল আওয়াজ আমাদের শ্রবণমুহূর্তেই চিরতরে বধির করে দিতে পারে।

বিভিন্ন প্রাবল্যমাত্রার শব্দ এবং স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি এড়াতে সেই সব শব্দের মধ্যে থাকবার অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময় কাল (প্রতিদিন) নীচের সারণিতে দেওয়া হল ঃ

সারণি ঃ উচ্চ প্রাবল্যমাত্রার শব্দের অনুমোদন যোগ্য সর্বোচ্চ সময় কাল

শব্দের প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)	অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সময়কাল (দৈনিক)
90	8 ঘণ্টা
95	4 ঘণ্টা
100	2 ঘণ্টা
105	1 ঘণ্টা
110	½ ঘণ্টা
115	¼ ঘণ্টা

শব্দদূষণের ফলে শ্রবণক্ষমতা হ্রাস হওয়া ছাড়াও বহু শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে।

শব্দদূষণের ফলে মানুষের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, তাঁরা উগ্রমেজাজ, স্নায়ুবিক রোগ, শ্বাসকষ্ট, মাইগ্রেণ, মাথাধরায় আক্রান্ত হতে পারেন। তাঁদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পেতে পারে, রক্তচাপ, রক্তে চিনির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। উচ্চগ্রামের একটানা শব্দ হৃদ রোগীদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। প্রসূতি নারী দীর্ঘকালীন শব্দযন্ত্রনার মধ্যে থাকলে বিকলাঙ্গ বা কম ওজনের সন্তান প্রসব করতে পারেন। এধরনের শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবারও সম্ভাবনা থাকে।

3.5.4 শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিপরীত প্রক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন প্রকার দূষণ আমাদের অণুষঙ্গ হয়ে পরেছে। 'শব্দদূষণ' তাদের মধ্যে একটি, এই দূষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে উপযুক্ত কিছু বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শব্দের প্রাবল্যমাত্রা এবং দূষণমাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রধানত চার ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

(i) উৎসেই শব্দের প্রাবল্যমাত্রা কমিয়ে আনা, (ii) উচ্চগ্রামে শব্দ আসার পথটাই বন্ধ করে দেওয়া। (iii) শব্দ উৎস থেকে শ্রোতার কাছে পৌঁছাবার পথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে এবং মাঝপথে শব্দ শোষক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং (iv) শ্রোতার জন্যে কিছু সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে উচ্চ প্রাবল্যের শব্দ হ্রাস পেয়ে শ্রোতার কানে প্রবেশ করে।

সর্বোপরি জনমানসে শব্দদূষণের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

যেমন রেডিও, টি. ভি. টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন উচ্চগ্রামে বাজানো বন্ধ করতে হবে। মোটরযানে কর্কশ আওয়াজের এয়ার হর্ণ বাজানো পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। কলকারখানায় যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে শব্দ প্রাবল্য কমিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে শব্দদূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রবল শব্দই সাধারণতঃ শব্দদূষণ ঘটায়, তাই অনেকক্ষেত্রে একটানা শব্দকে ভেঙ্গে দিতে পারলেও শব্দদূষণ মাত্রা কিছুটা কমানো যায়।

শব্দ উৎস থেকে উৎসারিত প্রবল আওয়াজ শ্রোতার কানে পৌঁছাবার আগেই মাঝপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে এবং মাঝ পথে শব্দ শোষকের দ্বারা শব্দের প্রাবল্যমাত্রা কিছুটা কমানো যায়। যেমন শব্দ কোনো শিল্প-উদ্ভুত হলে ঐ শিল্পাঞ্চলের চারিদিকে ঘন সংবদ্ধ নির্বাচিত গাছপালা লাগিয়ে শব্দ প্রাবল্য কমানো যেতে পারে। শহরে বিজ্ঞাপনের জন্য যে হোডিং ব্যবহৃত হয় সেগুলি শব্দ শোষক পদার্থ নির্মিত হলে রাস্তায় চলা যানবাহনজাত শব্দের প্রাবল্য কিছুটা কমানো যায়। হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘিরে গাছপালার ঘন আবেষ্টনী তৈরী করা প্রয়োজন। বড় ও ব্যস্ত রাস্তার ধারে বাড়ি করা বা কেনা উচিত নয়। আর তা থাকলে বাড়ির জানালা ও দরজায় ভারী পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো। এছাড়া শ্রোতার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন শব্দ প্রবণ পরিবেশে কাজ করলে কানে ইয়ার প্লাগ, ইয়ার মাফ ও নয়েজ হেলমেট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরোক্ত যন্ত্রগুলি শব্দ শোষকের কাজ করে। এই ধরনের যন্ত্রের অভাবে স্বাস্থ্যহানিকর নয় এমন তেলে ভেজানো বা মোম মাখানো তুলো কানে দিয়ে শব্দ প্রবন এলাকায় কাজ করা যেতে পারে।

উপযুক্ত নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চ শব্দ উৎস যেমন কলকারখানা, কোলাহলপূর্ণ ব্যবসাবাণিজ্যের এলাকা বসতি এলাকা থেকে দূরে স্থাপন করা দরকার। রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠ পরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যানবাহন জনিত শব্দদূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বিমানবন্দর, রেলস্টেশন বা রেল পরিবহণ ব্যবস্থা জনবসতি এলাকা থেকে দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সর্বপরি সার্বিক সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং সেগুলির কঠোর প্রয়োগ, ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং নিরবচ্ছিন্ন গঠনমূলক গণআন্দোলনের মাধ্যমেই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

3.6. অনুশীলনী

I. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

[1] ______ একটি তেজস্ক্রিয় দূষণ।
(a) সোডিয়াম, (b) রেডিয়াম, (c) পটাশিয়াম।

[2] শব্দের তীব্রতা হলো______।
(a) 10^{-12} ওয়াট প্রতি বর্গমিটার, (b) 10^{-11} ওয়াট প্রতি বর্গমিটার, (c) 10^{-10} ওয়াট প্রতি বর্গমিটার।

[3] ''ব্ল্যাকফুট ডিজিজ' (Black foot disease)-এর কারণ হলো _________ জাত দূষক পদার্থ।
(a) লেড, (b) রেডিয়াম, (c) আর্সেনিক।

[4] ভূমিক্ষয়ের একটি কারণ হলো_______।
(a) ধাপচাষ, (b) জুমচাষ, (c) বলয়চাষ।

[5] টো-ক্ষয় বা টো-এরোসন (Toe erosion) দেখা যায়_____ ।
(a) নদীর বাঁকে, (b) সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে, (c) নদীর মোহনায়।

[6] ______ একটি গ্রীন-হাউস গ্যাস।
(a) SO_2, (b) NO_2, (c) CO_2 ।

[7] ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় যে গ্যাসটি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সেটি হলো_______।
(a) মিথাইল আইসোকার্বনেট, (ii) মিথাইল আইসোক্লোরেট, (iii) মিথাইল আইসোসায়ানেট।

[8] বিশুদ্ধ জলের pH মাত্রা হলো______।
(a) 5, (b) 6, (c) 7।

[9] 'ক্লোরোসিস' রোগ সৃষ্টি হয়______ জনিত দূষণ থেকে।
(a) ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, (b) ওজোন গ্যাস, (c) ক্লোরিন গ্যাস।

[10] হেপাটাইটিস A হলো একটি ______ রোগ।
(a) জলবাহিত, (b) বায়ুবাহিত, (c) খাদ্যবাহিত।

[11] 'হাইপোথারমিয়া' রোগটি দেখা যায় ______ মধ্যে।
(a) মাছ, (b) গবাদি পশু, (c) পাখি।

[12] ISI কর্তৃক নির্ধারিত জলে আর্সেনিকের উপস্থিতির অনুমোদনযোগ্য পরিসীমা হলো_______।
(a) 0·05 mg/litre, (b) 0·5 mg/litre, (c) 0·005 mg/litre।

[13] যে যন্ত্রটি যানবাহনে লাগনো হয় কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রো-কার্বন জাতীয় যৌগের জারণের জন্য তা হলো______।
(a) ক্যাটা লাইটিক কনভার্টার, (b) ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর, (c) সাইক্লোন সেপারেটর।

[14] তাজমহলের মার্বেলগাত্রে ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটেছে _______ গ্যাসটির কারণে।
(a) NO_2, (b) SO_2, (c) CO_2।

[15] ডেঙ্গু রোগের ভাইরাস বহন করে ______ ।
(a) মশা, (b) মাছি, (c) ইঁদুর।

II. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

[1] 'সেস' আইল প্রণয়ন করা হয় কোন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে?

[2] 'মিনামাটা' ব্যাধির প্রাদুর্ভাব কোথায় ঘটেছিল?
[3] ক্লোরোফ্লুরো কার্বন নামক দূষকের প্রধান উৎস কি?
[4] ক্যাটালাইটিক কনভার্টার কোন দূষণ দূরীকরণে ব্যবহার করা হয়?
[5] জীবদেহ পচনের ফলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়?
[6] খালি পায়ে মাঠ বা কৃষিক্ষেত্রে হাঁটার ফলে কোন রোগ হতে পারে?
[7] কোন কীটনাশকের ব্যবহার ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ ?
[8] ভারতবর্ষে কৃষিজমির পরিমাণ শতকরা কত ভাগ ?
[9] কোন ভাইরাস থেকে এডস (AIDS) হয়?
[10] এডস্ (AIDS) এর সম্পূর্ণ নাম কি?
[11] বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ওজোন স্তরটি অবস্থিত?
[12] বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে উদযাপন করা হয়?
[13] ডিডিটি কথাটির সম্পূর্ণ রূপ কি?
[14] শব্দের তীব্রতা কি?
[15] শব্দের প্রাবল্য কাকে বলে?
[16] কোন মশা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়?
[17] প্রোটোজোয়া ঘটিত একটি রোগের নাম লেখো।
[18] 'গ্রীন বেঞ্চ' কি?

III. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

[1] 'সিস্ট' কি?
[2] আবহমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির অত্যাধিক পরিমাণ উপস্থিতির ফলে পরিবেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
[3] চেরনোবিল দুর্ঘটনার ক্ষতিকর ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[4] 'জৈব অক্সিজেন চাহিদা' কি এবং তা কিভাবে পরিমাপ করা হয়?
[5] জলের pH মাত্রা দ্বারা কি বোঝানো হয়? বিশুদ্ধ জলে ঐ মাত্রা কত হওয়া প্রয়োজন?
[6] আর্সেনিক দূষণের কারণ কি? এর ফলে কি রোগ সৃষ্টি হয়, তার উপসর্গ বা লক্ষণগুলি কি কি?
[7] ভূমিদূষণ থেকে সৃষ্ট রোগগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
[8] ভূমিক্ষয় রোধের জন্য কার্যকরী পদ্ধতিগুলি কি কি?
[9] শব্দদূষণ রোধের পদ্ধতিগুলি কি কি?
[10] কালাজ্বরের ওষুধরূপে কোন ধাতু স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার করা হয়? ঐ ধাতু জনিত দূষণের প্রধান উৎসগুলি ও তার ক্ষতিকর প্রভাব সংক্ষেপে বলো।

একক—4 ❑ বিশ্ব পরিবেশ সমস্যা (Global Environmental Issues)

4.1 গ্রিন হাউস প্রভাব

4.1.1 পৃথিবীর ওপর গ্রিন হাউসের প্রভাব

4.2 গ্রিন হাউস গ্যাস

4.3 বিশ্ব উষ্ণকরণ

4.3.1 সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

4.3.2 বিশ্ব উষ্ণকরণ-এর চিহ্ন বা নজির

4.4 ওজোন ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

4.4.1 বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের উৎপত্তি

4.4.2 বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের গুরুত্ব

4.4.3 বর্তমান বায়ুমণ্ডলে ওজোনের অবস্থা

4.4.4 অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন ছিদ্র

4.4.5 ওজোন গর্ত সৃষ্টির কারণ

4.4.6 ওজোনস্তর ক্ষয়ে ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগের ভূমিকা

4.4.7 অন্যান্য ওজোন ধ্বংসকারী যৌগ

4.4.8 ওজোন বিনাশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

4.5 অম্লবৃষ্টি ঃ উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

4.6 এলনিনো

4.7 লা-নিনা

4.8 বৃক্ষছেদন

4.9 পরিবেশ আন্দোলন

4.9.1 চিপ্‌কো আন্দোলন

4.9.2 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

4.9.3 তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

4.9.4 সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

4.10 জীববৈচিত্র্য

4.10.1 ভারতের জীববৈচিত্র্য

4.10.2 জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

4.10.3 জীববৈচিত্র্যের সংকট

4.10.4 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

4.11 ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা

4.11.1 নীতি নির্দেশিকা

4.12 অনুশীলনী

4.1. গ্রিন হাউস প্রভাব (Green house effect)

পৃথিবীতে যে সমস্ত সমস্যা বর্তমানে মানুষের স্থায়িত্বকালকে বিপন্ন করে তুলেছে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা "গ্রিন হাউস এফেক্ট" তার মধ্যে অন্যতম। এককথায় এটি মানুষের সৃষ্ট তাপদূষণ সমস্যা। কোটি কোটি বছর ধরে বাতাসের যে কার্বন (কার্বন ডাইঅক্সাইডের) মাটির নিচে জীবাশ্মরূপে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেছিল তা মাত্র কয়েকশো বছরের মধ্যে অতি ব্যাপকভাবে বাতাসে ফিরিয়ে দেবার ফলেই মূলত এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে শীতপ্রধান দেশে যেখানে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকে সেখানে উদ্ভিদ প্রতিপালনের জন্য বাগানে স্বচ্ছ কাচের (glass) ছাউনিযুক্ত ঘর ব্যবহার করা হয়। এই ঘরকে সবুজ ঘর বা গ্রিন হাউস বলে। শীতের দিনে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকলেও এই সবুজ ঘরের ভিতর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা 38ºC–39º-র (100 – 102ºF) মধ্যে থাকে। ফলে উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনে কোনো অসুবিধা হয় না। এমনকি প্রবল ঠান্ডাতেও ফুল, ফল, সবজির সমারোহ তৈরি হয়। এখন প্রশ্ন হল এর কারণ কী?

সূর্য থেকে আগত বিকিরণের মধ্যে থাকে দৃশ্যমান রশ্মি এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি। সূর্যের আলো অর্থাৎ ওই সব রশ্মির ক্ষেত্রে কাচ (glass) স্বচ্ছ (transparent) বস্তুর মতো কাজ করে অর্থাৎ সূর্যের আলো কাচের মধ্য দিয়ে গ্রিন হাউসে সহজেই প্রবেশ করে। কিন্তু মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ কর্তৃক পরিত্যক্ত তাপীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে কাচ অস্বচ্ছ (opaque) বস্তুর ন্যায় আচরণ করে ফলে তাপ কাচের মধ্য দিয়ে বাইরের বায়ুমণ্ডলে ফিরে যেতে পারে না। ফলে কাচঘরের তাপমাত্রা বাড়ে এবং এই নিয়ন্ত্রিত উষ্মতায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ফুল, ফল, ভালো হয়।

সমগ্র পৃথিবীর পরিমণ্ডলও এক বড়ো গ্রিন হাউস। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ হলেও বেশ কিছু গ্যাস থাকে (যেমন, CO_2, CH_4, ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন CFC, N_2O ইত্যাদি) যাদের তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি বৈশিষ্ট্য এমনই যে তারা দৃশ্য আলোতে স্বচ্ছ কিন্তু অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের ওইসব গ্যাস পৃথিবীকে ঢাকনার মতো চেপে রেখে অবলেহিত রশ্মিগুলিকে শোষণ করে আটকে দেয় এবং বায়ুমণ্ডলকে উষ্মতর রাখে। এক্ষেত্রে ওই গ্যাসগুলি পৃথিবীর গ্রিন হাউসের কাচ আস্তরক হিসাবে কাজ করে। তাই বায়ুমণ্ডলে ওইসব গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির দরুন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত নানান দুর্ঘটনাকে একসঙ্গে গ্রিন হাউস প্রভাব (green-house effect) বলা হয়।

4.1.1 পৃথিবীর ওপর গ্রিন হাউসের প্রভাব (Green house effect)

গ্রিন হাউস প্রভাবের কারণ ও ফলাফল নিম্নে বর্ণিত সারণি থেকে স্পষ্ট জানা যায়।

কারণ	ফলাফল
১। পৃথিবীতে সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপ বিকিরিত হয় তার 51 শতাংশ ভূমি শোষণ করে এবং বাকি অংশ নানা পদ্ধতিতে বিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত হয়। এর ফলে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ধরে রাখে।	১। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অ্যান্টার্কটিক গ্রিনল্যান্ড ও পর্বত গাত্রে অবস্থিত হিমবাহ ও বরফের স্তর গলে জলতলের উচ্চতা বেড়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠের উপকূলবর্তী এলাকা প্লাবিত হলে 60 শতাংশ উপকূলের বাসিন্দারা বাসস্থান হারাবে।

কারণ	ফলাফল
২। বায়ুদূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস যেমন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) প্রভৃতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবী গ্রিন হাউসের মতো কাজ করছে।	২। জলস্তর বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, চিন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকার মোজাম্বিক, মিশর, নাইজিরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের উপকূলবর্তী এলাকা।
৩। এই গ্যাসসমূহ পৃথিবীর চারদিকে একটা আবরণের সৃষ্টি করেছে। ফলে সৌর বিকিরণ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যেতে পারে না। এর ফলে পৃথিবীতে উত্তাপের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।	৩। বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনের জন্য ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন, খরা, বন্যা প্রভৃতি বেশি করে দেখা যাবে। এ ছাড়া ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংক্রামক রোগ মহামারির মতো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

যে সমস্ত গ্যাসগুলি গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী তাদের উৎস ও প্রভাব নিম্নে সারণিতে প্রকাশ করা হল।

গ্যাসের নাম	উৎস	প্রভাব
১। কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2)	● জীবাশ্মঘটিত জ্বালানি (খনিজতেল, কয়লা প্রভৃতি) ব্যবহারের ফলে। ● শিল্প কারখানা ও মোটর গাড়ি ব্যবহারের ফলে। ● সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে। ● অরণ্য সংহার ও সবুজ নিধনের ফলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।	● পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হিমযুগে কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে পরিমাণ ছিল আজ তা বেড়েছে প্রায় 1800 কোটি টনের মতো, 0.5% হারে এই বৃদ্ধি ঘটেছে। ● পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পেলে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় 36° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে।
২। মিথেন (CH_4)	● জলাভূমি ও কৃষিক্ষেত্রে গাছপালা প্রভৃতির পচনের ফলে, বিভিন্ন জৈব বর্জ্যে, কিছু জীবজন্তুর সাহায্যে এবং তেলখনি থেকে মিথেনের সৃষ্টি হয়। ● ভারত, চিন বিভিন্ন দেশগুলির জলমগ্ন ধানখেত গুলি মিথেনের বড়ো উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।	● মিথেনের অপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে প্রায় 21 গুণ বেশি।
৩। নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	● মাটিতে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার বিক্রিয়া ও গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার সৃষ্টি হয়।	● এটি বছরে 0.25% হারে বাড়ছে। ● এটির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে 270 গুণ বেশি।

গ্যাসের নাম	উৎস	প্রভাব
	● কলকারখানা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এটি সৃষ্টি হয়।	
৪। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFC) [এটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য CFC_{11} এবং CFC_{12}]	● ক্লোরিন ও ফ্লুরিনের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ধরনের গ্যাস হল CFC। বিভিন্ন শিল্পে, যেমন রেফ্রিজারেটার ও শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র তৈরির জন্য, এরোসল, স্প্রেফ্যান, প্লাস্টিক, প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ● কলকারখানা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি থেকে দহনজনিত কারণেও এটি সৃষ্টি হয়।	● বায়ুস্তরের 10-50 কিলোমিটার ওপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অনেকদিন থাকে। ● তাপ ধারণের ক্ষেত্রে এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে 7000-14000 গুণ বেশি শক্তিশালী।
৫। নিম্নস্তরের ওজোন (O_3)		● এটির তাপধারণ ক্ষমতা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের থেকে 2000 গুণ বেশি।

4.2. গ্রিন হাউস গ্যাস (Green house gas)

গ্রিন হাউস প্রভাব ঘটাতে সক্ষম গ্যাসগুলিকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইডকে (CO_2) প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। তা ছাড়া অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি হল মিথেন (CH_4), নাইট্রিক অক্সাইড (N_2O), ফ্রিয়ন গ্যাস (CFC), জলীয় বাষ্প এবং ওজোন (O_3)। এ গ্যাসগুলির ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় অনেক কম হলেও পৃথিবীর উত্তপ্তকরণে এরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ এক অণু CH_4 এর গ্রিন হাউস এফেক্ট এক অণু CO_3 এর চেয়ে 21–23 গুণ অধিক। CFC-11 এর ক্ষেত্রে তা প্রায় 12000 গুণ বেশি *(সারণি 4.1)*।

সারণি 4.1 ***প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ এবং গ্রিনহাউস এফেক্টে ভূমিকা***

প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস	গ্রিন হাউস আনুপাতিক অবদান	প্রতি অণু CO_2-এর সাপেক্ষে উষ্ণকরণ ক্ষমতা
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	55%	1
মিথেন (CH_4)	15%	23 গুণ বেশি
ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC)	14%	12,000 গুণ বেশি
নাইট্রিক অক্সাইড (N_2O)	06%	270 গুণ বেশি
জলীয় বাষ্প (H_2O)	04%	5 গুণ কম
ওজোন (O_3)	06	10 গুণ বেশি

উৎস ঃ Global warming — The Green Peace Report, 1995

● (i) **কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)**

বিগত বহু কোটি বছর ধরে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন জৈবিক প্রক্রিয়ায় মূলত সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানিতে (কয়লা ও খনিজ তৈল) পরিণত করেছিল তা শিল্পবিপ্লবের পর মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মানুষ কতৃক জ্বালিয়ে দেবার ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা CO_2 প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের আগে উত্তর গোলার্ধে বাতাসে CO_2 এর ঘনত্ব ছিল মাত্র 0·02% বা 280 ppm. তা দাঁড়িয়েছে 0·035% বা 350 ppm*-এ। এই সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানির অবাধ ব্যবহার এবং সিমেন্ট উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণ CO_2 বায়ুমণ্ডলে হয়। ফলে 1870 থেকে 1990 -এর মধ্যে CO_2-এর পরিমাণ বেড়েছে 21·5% (290 – 350 ppm)। অধিকাংশ পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে বর্তমান হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়তে থাকলে আগামী 2030 থেকে 2050 খ্রিঃ-এর মধ্যে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাাণ প্রায় দ্বিগুণ হবে, ফলে দৈনিক গড় তাপমাত্রা বাড়বে 2ºC – 5ºC।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎস হল কার্বন। পৃথিবীতে এই কার্বনের পরিমাণ সীমাব্ধ বা নির্দিষ্ট। কার্বন প্রকৃতিতে কয়েকটি প্রাকৃতিক উৎসে অবস্থান করে এবং এক উৎসে থেকে অন্য উৎস চক্রাকারে পরিবর্তিত হয় ফলে কার্বনের উপাদান ও বিনাশের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে চলেছে। প্রতিবছর প্রায় 100 বিলিয়ান টন কার্বন সমুদ্র থেকে মুক্ত হয়ে বাতাসে মিশছে এবং সম পরিমাণ কার্বন বায়ুমণ্ডল থেকে সমুদ্রে যুক্ত হচ্ছে স্থলবাসী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বসনক্রিয়ার মাধ্যমে বছরে 100 বিলিয়ান টন কার্বন বাতাসে যোগ করছে এবং সবুজ উদ্ভিদরা ওই পরিমাণ কার্বন ওই সময়ের মধ্যে বাতাস থেকে মুক্ত করে জৈবপদার্থে যুক্ত করছে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়। একে কার্বন চক্র বলে। কিন্তু বর্তমানে মানুযের বিভিন্ন কার্যকলাপে এই ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। মানুষ প্রতিবছর প্রায় 555 মিলিয়ান টন কার্বন জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলে সংযোজিত করছে। প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ধ্বংস সাধনের ফলে আরো প্রায় 1000 মিলিয়ান টন কার্বন বায়ুমণ্ডলে থেকে যায় সালোকসংশ্লেষের পরিমাণ কমে যায় বলে। ফলে মোট প্রায় 6666 মিলিয়ন টন কার্বন প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে মিশছে। এর প্রায় অর্ধেক দ্রবীভূত হয় সমুদ্রের জলে। বাকি অর্ধেক বায়ুমণ্ডলে থেকে যাচ্ছে এবং গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্ম দিচ্ছে। বর্তমানে গ্রিন হাউস এফেক্টে CO_2-এর ভূমিকা প্রায় 55%।

সারণি 4.2 ঃ পৃথিবীতে মানুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে কার্বন নিষ্ক্রমণের মোট পরিমাণ

বৎসর	কার্বন (মিলিয়ান টন)
1950	1630
1955	2050
1960	2586
1965	3154
1970	4090
1975	4628
1980	5249
1985	5338
1990	5430
1995	5616
2000	5017

উৎস ঃ Council of Science and Environment, 2004

*ppm : Parts per million

● (ii) **মিথেন (CH_4) ঃ** CO_2-র পর বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্রিন হাউস গ্যাস হল মিথেন। বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনত্ব খুবই সামান্য (1.6 ppm) হলেও গ্রিন হাউস এফেক্টের ক্ষেত্রে মিথেন CO_2 এর থেকে 21–25 গুণ বেশি সক্রিয়। বর্তমানে গ্রিন হাউস এফেক্টে মিথেনের অবদান প্রায় 15%। ধানজমি ও জলাভূমি হলো মিথেনের প্রধান উৎস। তা ছাড়া গবাদি পশুর গোবর থেকে, পচা জৈব পদার্থ থেকে কয়লা ও খনিজ তৈলের ঘন অঞ্চল থেকে প্রচুর মিথেন গ্যাস নিয়ত বায়ুমণ্ডলে মিশছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে (ভারত সহ) এখন বছরে 2/3 বার ধান চাষ করার ফলে মিথেনের দায়ভারের অনেকটাই এই সমস্ত দেশের উপর এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে 440 – 600 মিলিয়ান টন মিথেন বায়ুমণ্ডলে এসে মিশছে।

বাতাসে অধিক পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস (CO) বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করছে। মিথেনের আপনা আপনি বিনষ্ট হবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া CO গ্যাস ব্যাহত করে। তা ছাড়া যে লক্ষ লক্ষ টন মিথেন হিমমণ্ডলের তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আছে তা গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে বরফ গলতে শুরু করায় বাইরে বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশছে।

● (iii) **ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন (CFC) ঃ** ক্লোরিন, ফ্লুরিন এবং কার্বনের যৌগ ক্লোরোফ্লুওরো কার্বনের বাণিজ্যিক নাম ফ্রেয়ন (Freon)। এটি একপ্রকার নিষ্ক্রিয়, অদাহ্য এবং সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় পদার্থ যা গ্রিন হাউস এফেক্টে CO_2 এর চেয়ে প্রায় 10,000 গুণ বেশি সক্রিয়। তবে বায়ুমণ্ডলে এর ঘনত্ব CO_2 কিংবা মিথেনের চেয়ে অনেক কম— মাত্র 0·000225%। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন নির্বুদ্ধিতায় প্রতি বছর এর ঘনত্ব বাড়ছে 4·6% হারে।

প্রধান রেফ্রিজারেটার, এয়ারকন্ডিশনার, কটিন প্লাস্টিক, ফোম, স্প্রেফ্যান ইত্যাদির ব্যবহারে প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয় প্রায় 1 মিলিয়ান টন CFCs। CFC সহজে বিক্রিয়া করে না। দৃশ্যমান বা UV রশ্মি দ্বারা বিয়োজিত হয় না। ফলে শতাধিক বছর বায়ুমণ্ডলে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। গ্রিন হাউস এফেক্ট সৃষ্টিতে CFC অবদান প্রায় 14%। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের উন্নত দেশ সমূহে সবচেয়ে বেশি CFCs উৎপন্ন হয় এবং সেই কারণে ওই দেশগুলো বেশি দায়ী। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর প্রায় 67% শিল্পোন্নত দেশের অবদান এবং এ প্রায় 25% -এর বেশি দায়ী কেবল ওইসমস্ত দেশে উৎপন্ন CFCs গ্যাসগুলি।

● (iv) **নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) ঃ** নাইট্রোজেন সার থেকে জীবাণুর বিক্রিয়ায়, জৈব পদার্থের জ্বলনে ইত্যাদি নানা কারণে বায়ুমণ্ডলে NO_2 মিশে চলেছে। বায়ুমণ্ডলে এর ঘনত্ব 0·28 – 0·30 ppm এবং বছরে শতকরা 0·2 অংশ হারে বড়ছে। এভাবে বাড়তে থাকলে 2050 সালে NO_2'র পরিমাণ আনুমানিক প্রায় 0·35 – 0·45 ppm হবে। বর্তমানে গ্রিন হাউস এফেক্ট সৃষ্টিতে এর ভূমিকা প্রায় 6% এবং গ্যাসটি CO_2-এর তুলনায় প্রায় 150 গুণ বেশি সক্রিয় অতিবেগুনি রশ্মি (UV) কিংবা বায়ুমণ্ডলের কসমিক রশ্মি সাথে বিক্রিয়া করে এই গ্যাসটি ভারে কিংবা বিলীন হয়। তবে তার জন্য ন্যূনতম 150 বছর সময় লাগে।

● (v) **জলীয় বাষ্প (H_2O) ঃ** জলীয়বাষ্পের ঘনত্ব বাতাসে প্রায় 1·4% হলেও গ্রিন হাউস এফেক্ট এর ভূমিকা প্রচুর। জলীয়বাষ্প সূর্যের ইনফ্রারেড রশ্মি শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্ট মেঘ পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপকে বাধা দেয়।

সারণি 4.3 ঃ বিভিন্ন দেশের বাতাসে নিক্ষিপ্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ

অঞ্চল	সমগ্র বিশ্বে মোট নিক্ষিপ্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণের শতকরা হার (%)
● **শিল্পোন্নত দেশ (66·95)**	
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	27.44
জাপান	2.51
পশ্চিম ইউরোপ	11.89
পূর্ব ইউরোপ	4.54
সি. আই. এস	13.08
অস্ট্রেলিয়া	2.00
● **উন্নয়নশীল দেশ (33.05%)**	
ভারত	0.013
চিন	0.57
ব্রাজিল	18.21
এশিয়া (জাপান বাদে)	7.97
আফ্রিকা	3.04
আমেরিকা (USA, কানাডা বাদে)	22.035%

উৎস ঃ Council of Science and Environment (CSE), ২০০৪

● (v) **ওজোন (O_3) ঃ** বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে O_3 গ্যাসের অবস্থান গ্রিন হাউস গ্যাস হিসাবে কাজ করে। O_3 এর সর্বাধিক গাঢ়ত্ব প্রায় 10 ppm যা ক্রান্তীয় অঞ্চলে 25 কিমি ঊর্ধ্বে, 21 কিমি ঊর্ধ্বে মধ্য অক্ষাংশে এবং 18 কিমি ঊর্ধ্বে মেরু অঞ্চলে দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলে O_3 এর গ্রিন হাউস এফেক্টের পরিমাণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন কারণ অঞ্চল ভেদে এবং উচ্চতা ভেদে O_2 খুবই পরিবর্তনশীল।

4.3. বিশ্ব উষ্মকরণ (Global Warming)

4.3.1 সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Definition and Characteristics)

পৃথিবীর দীর্ঘ ভূতাত্তিক ও জলবায়ুগত বিবর্তনে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মানে আসার পরই এখানে প্রাণের স্পন্দন মিলেছে। পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা 15ºC। সূর্য পৃথিবীর এই তাপমাত্রার প্রধান এবং একমাত্র উৎস। পৃথিবীর এই স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় অবশয পৃথিবীপৃষ্ঠে আগত সৌর কিরণ (Incoming solar radiation) এবং পৃথিবী থেকে বিগত বা প্রতিফলিত সৌর কিরণের (Outgoing solar radiation) ভারসাম্য দ্বারা। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক গ্যাসীয় উপাদান এই তাপীয় ভারসাম্যে এতকাল কোনো প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই স্বাভাবিক ভারসাম্যের বিঘ্নতা বিজ্ঞানী মহলের নজরে আসতে শুরু করে। সারা বিশ্ব জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্মতা সামান্য হারে বাড়তে শুরু করে। 1880 থেকে 1980 এই একশো বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় 0·6ºC। আশঙ্কা করা যাচ্ছে 2100 সাল নাগাদ এই তাপমাত্রা সর্বনিম্ন আরও 1·4ºC এবং সর্বোচ্চ আরও 5·8ºC বাড়বে। তার কারণ উষ্মতা বৃদ্ধির এই হার ক্রমবর্ধমা। সারা পৃথিবীর এই গড় উষ্মতার ক্রমবর্ধমান অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ''গ্লোবাল ওয়ার্মিং'' (Global Warming)। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা উষ্মকরণের এই হার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানামত থাকলেও পৃথিবী যে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এনিয়ে দ্বিমত নেই। এবিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছেছে।

কারা কারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ দায়ী

প্রথমে জানা গিয়েছিল CO_2 একমাত্র গ্রিন হাউস গ্যাস, অর্থাৎ CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। পরে জানা গেছে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন ও ওজন গ্যাসও কম দায়ী নয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষমতা এদের মধ্যে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের বেশি, তারপর ক্রমান্বয়ে আসবে নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন ও সবেশেষে কার্বন ডাইঅক্সাইড।

ক্ষমতা কম হলেও পৃথিবীপৃষ্ঠে উষ্মতা বৃদ্ধির জন্য মূল দায়ী CO_2। উষ্মতা বৃদ্ধির 55 শতাংশের জন্য দায়ী CO_2, 15 শতাংশের জন্য দায়ী মিথেন, 14 শতাংশের জন্য দায়ী ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন, 6 শতাংশের জন্য দায়ী নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজোন ও জলীয় বাষ্প প্রত্যেকে প্রায় 4 শতাংশ করে দায়ী। প্রতিবছর এই গ্যাসগুলির পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তা এই রকম— কার্বন ডাইঅক্সাইড 0·4 শতাংশ; মিথেন 1 শতাংশ; নাইট্রাস অক্সাইড 0·3 শতাংশ ও ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন 5 শতাংশ।

এখন প্রশ্ন হল এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি কী হারে হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা। বিশেষজ্ঞদের মতে এর উত্তর হ্যাঁ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব ইতিমধ্যে আমরা পাচ্ছি।

4.3.2 বিশ্ব উষ্মকরণ-এর চিহ্ন বা নজির (Evidence of Global Warming)

সারা পৃথিবীতে উষ্মকরণ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর নেগেটিভ প্রভাব কী কী হয়েছে বা হচ্ছে এই নিয়ে একদল বিজ্ঞানী গবেষণায় রত। এদের গবেষণায় ইতিমধ্যে আমরা যে যে নজির বা চিহ্ন পেয়েছি তা সংক্ষেপে আলোচিত হল।

➠ (1) **বায়ুমণ্ডলে CO_2 বৃদ্ধি ঃ** আমরা আগেই জেনেছি বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর মাত্রা শিল্প বিপ্লবের পর অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। শিল্পবিপ্লবের আগে 280 ppm থেকে বর্তমানে প্রায় 360 ppm এ পৌঁছেছে— অর্থাৎ প্রায় 30% বৃদ্ধি। এই মাত্রা গত 160,000 বছরের মধ্যে সর্বাধিক।

➠ (2) **বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের বৃদ্ধি (Increase of methane gas) :** মিথেন বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্রিন হাউস গ্যাস। এই গ্যাসও গত 100 বছরে 0·7 ppm থেকে 1·7 ppm-এ তে অর্থাৎ প্রায় 145% বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর 540 মিলিয়ান টন মিথেন বায়ুমণ্ডলে মেশে।

➠ (3) **আবহাওয়ার ঘনঘন পরিবর্তন (Frequent change weather) :** গত দুশো (1800 – 2000) বছরের মধ্যে 1999 ছিল সর্বাধিক তাপীয় বছর এবং এরই মত চরম তাপীয় অবস্থা এই সময়ে 5 বার হয়েছিল। ফলে খরা ও বন্যার প্রকোপও বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। আমেরিকা ইউরোপে দেখা গেছে গত 50 বছরের মধ্যে শীতলতম শীতকাল। এই সময়ে তুষারপাত, তুষারঝড় ও বন্যার তীব্রতাও বেড়েছে। গত 25 বছরের মধ্যে তীব্রতম তুষার ঝড় হয়েছে জাপান ও কোরিয়ায়। এই সময়ে থাইল্যান্ড শীতলতম শীতকালের মুখোমুখি হয়েছে। এই ধরনের শীতকাল এসেছে তীব্রতম গ্রীষ্মের পরে। লন্ডনে দেখা গেছে 300 বছরের মধ্যে শুষ্কতম NOAA-র (National Climatic data centre) ডিরেক্টর থমাস কার্ল (Thomas Karl) এর মতে গত বছরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। গত শেষ শতাব্দীতে (1900 – 2000) পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ 0·6ºC। এবং শেষ হিমযুগের পর (18000 – 2000 বছর আগে) বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা প্রায় 5º – 9º F বেড়েছে।

➠ (4) **হিমবাহের অন্তর্ধান কিংবা পশ্চাদপসরণ (Disappearing or retreat of glacier) :** বরফের গলন কিংবা হিমবাহের পশ্চাদপসারণ হল গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সবচেয়ে বড়ো এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। পৃথিবীর 6টি মহাদেশেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে।

(i) উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড়ো হিমবাহ বেরিং হিমবাহ (Bering glacier) যা প্রায় 11 দৈর্ঘ্যে কমেছে; অর্থাৎ ইতিমধ্যে সে তার আয়তনের 20 – 25% হারিয়েছে।

(ii) দক্ষিণ পেরুর কুৎরি হিমবাহ (Qori glacier) গত 14 বছরে (1983 – 2000) আগের 100 বছরের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি হারে গলতে শুরু করেছে।

(iii) গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহগুলো সমুদ্রের দিকে বেশি গতিতে এগোতে শুরু করেছে। এটি সম্ভবত হিমবাহ গলন এবং গলনের ফলে উৎপন্ন জল হিমবাহের নীচে পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে কাজ করার ফলে ঘটেছে।

(iv) আমাদের ঘরের কাছে হিমালয়ের হিমবাহেও একই ঘটনা লক্ষ করা গেছে। বর্তমানে গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় প্রতি বছরে 30 মিটার হারে পেছোচ্ছে। এই হার গত 1935 এবং 1990-এর মধ্যে প্রায় গড়ে 18 মিটার এবং 1842 ও 1935-এর মধ্যে ছিল গড়ে প্রায় 7 মিটার।

এই প্রসঙ্গে নেপাল পর্বতারোহণ সংস্থার (Nepal Mountaineering Association) ডিরেক্টরের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। আজ থেকে 50 বছর আগে এডমন্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে (Edmond Hillary ও Tenzing Norgay) যে স্থান দিয়ে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তা বর্তমানে সরেছে 4·8 কিমি অর্থাৎ বেড়েছে অতিরিক্ত প্রায় 2 ঘণ্টার পথ।

➠ (5) **সুমেরু ও কুমেরু সাগরে বরফের গলন (Melting of Arctic and Antartic ice) :** পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের আর্টিক ও অ্যান্টার্কটিকা বিস্তৃত বরফরাশিও গলতে শুরু করে অস্বাভাবিক হারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন গত 1958 থেকে 1976-তে যেখানে সুমেরুতে বরফের গড় উচ্চতা ছিল 3 মিটার তা 1993 থেকে 1997-এর গড় হিসাবে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় 1·8 মিটারে। অর্থাৎ গত 30 বছরে সুমেরুর বরফ প্রায় 40% আয়তনে কমেছে— বছরে গড়ে সংকুচিত হয়েছে প্রায় 38,000 বর্গ কি.মি.। বিজ্ঞানী আরও বলেছেন যে এভাবে চলতে থাকলে আগামী 50 বছরের পর সুমেরুর গ্রীষ্মে আর কোনো বরফ পাওয়া যাবে না।

কুমেরু অঞ্চলেও প্রায় 5ºF হারে গত 50 বছরে প্রায় 5ºF তাপমাত্রা বেড়েছে। ফলে বিশাল বিশাল হিমশৈল দক্ষিণ মেরুর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

➠ (6) **ক্রান্তীয় রোগের প্রাদুর্ভাব (Outbreak of Tropical diseases)** ঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নিত্যনতুন রোগের প্রার্দুভাবের কারণও এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি। নিউজিল্যান্ড-এর ''ওয়েলিংটন স্কুল অফ মেডিসিনের'' চিকিৎসকরা এ বিষয়ে গবেষণা করেন। তাদের মতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘনঘন ডেঙ্গু জ্বরের (Dengue fever) প্রাদুর্ভাবের পিছনে গ্লোবাল ওয়ার্মিংই দায়ী। এই একই কারণে আফ্রিকার নিত্য নতুন দেশে পীতজ্বরের (yellow fever) প্রকোপও দেখা দিচ্ছে। হাবার্ড স্কুল অব্ পাবলিক হেলথের (Harvard's School of Public Health) চিকিৎসকদের মতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বর্তমানে এনকেফালাইটিস (encephalitis), ম্যালেরিয়া (malaria) ইত্যাদির মত রোগসমূহ এশিয়া, লাতিন অ্যামেরিকা কিংবা আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চ অংশে দেখা দিচ্ছে যা গত 50 বছরে প্রায় ঘটেনি।

➠ (7) **অন্যান্য প্রভাব (Other symptoms)** ঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea level rise)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে প্রতি 20 বছরে এক ইঞ্চি করে। পৃথিবীর প্রবাল দ্বীপগুলি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত 2000 অক্টোবরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ''নাইন্থ ইনটারন্যাশনাল কোরাল রীফ সিম্পোজিয়ামে''র তথ্য (9th International Coral Reef Symposium) অনুসারে ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রায় 27% প্রবাল দ্বীপ নষ্ট হয়ে গেছে। আগামী 20 বছরে বাকি দ্বীপগুলোর প্রায় সমস্ত প্রবাল মারা যাবে যদি বর্তমান হারে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থাকে। অ্যান্টার্টিকায় আলগির (algae) উপর নির্ভরশীল ক্রিলের (Krill) সংখ্যা ক্রমশ কমা এবং পাখিদের পরিযায়ীতার (migratory nature) পরিবর্তনও গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

4.4. ওজোন ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Definition and Characteristics of ozone gas)

ওজোন হল নীলরঙের মৎস গন্ধযুক্ত এক ধরনের গ্যাস— অক্সিজেনের সঙ্গে যার তফাত খুব সামান্য। ওজোনকে অক্সিজেন গ্যাসের রূপভেদও বলা যায়। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু পুড়ে তৈরি হয় একটি ওজোন অণু (O_3)। 1840 খ্রিঃ বিজ্ঞানী স্কোনবি (Sconbien) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চ অংশে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন অণু এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সমগ্র স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও এর ঘনত্ব সর্বাধিক থাকে 15–35 কিমি উচ্চতায়। এই অংশ ওজোনস্তর (Ozone layer) বা ওজোনোস্ফিয়ার (Ozonosphere) নামে পরিচিত। ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোনের গাঢ়ত্ব খুবই কম— মাত্রা 10 ppm। একে ভূপৃষ্ঠের বায়ুচাপ ও তাপমাত্রায় নিয়ে এলে 3 মিলিমিটার পুরু বাতাসের মতো হবে এবং ওজন হবে প্রায় 30 কোটি টনের মতো। ওজোনের সর্বাধিক গাঢ়ত্ব ক্রান্তীয় অঞ্চলে 25 কিমি উর্দ্ধে, 21 কিমি উর্দ্ধে মধ্য অক্ষাংশে আর 18 কিমি উর্দ্ধে মেরু অঞ্চলে।

সাধারণত বায়ুমণ্ডলে ওজোনের ঘনত্বকে পিপিএম (ppm) এর বদলে ডবসন এককে (Dobson unit) প্রকাশ করা হয়। এক ডবসন (DB) একক বলতে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 0·001 মিলিমিটার পুরু ওজোনের ঘনত্বকে বোঝায়। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ওজোনের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ে। ক্রান্তীয় (0° – 30°) অঞ্চলে এই ঘনত্ব মাত্র **250 DU**। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের (30° – 60°) বায়ুমণ্ডলে ওজোনের স্বাভাবিক ঘনত্ব **350 DU** এবং মেরু দেশীয় অঞ্চলে (60°-এর অধিক) প্রায় **450 DU**।

নিম্ন অক্ষাংশ থেকে উচ্চ অক্ষাংশে ওজোনের ঘনত্ব অধিক হওয়ায় মূল কারণ স্ট্র্যাটোস্ফিরিক অঞ্চলে নিয়মিত উচ্চ বায়ু প্রবাহের ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের থেকে উপমেরু অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের পরিবহন বা স্থানান্তর।

4.4.1 বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাসের উৎপত্তি (Origin of O_3 gas in the atmosphere)

সূর্য থেকে অনবরত যে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোচ্ছে তার সঙ্গে অতিবেগুনি বা আলট্রাভায়োলেট (Ultra violate rays) রশ্মিও আসছে। এই অতিবেগুনি রশ্মিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা—

- (i) ইউ ভি এ (UV-A) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 315 – 400 nm*
- (ii) ইউ ভি বি (UV-B) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 280 – 315 nm
- (iii) ইউ ভি সি (UV-C) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 100 – 280 nm

দেখা গেছে এই অতিবেগুনি রশ্মির মধ্যে সবচেয়ে কম যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ইউ ভি সি এবং খানিকটা ইউ ভি বি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে ভেঙে জায়মান অক্সিজেন তৈরি করে। আর এই জায়মান অক্সিজেন পরমাণু (O) আর একটি অক্সিজেন অণুর (O_2) সঙ্গে মিলে ওজোন তৈরি করে। এই শেষোক্ত বিক্রিয়াটি প্রচণ্ড তাপ উৎপাদন হওয়ায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে বায়বীয় তাপমাত্রা ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

$$O_2 \xrightarrow{\text{UV C + UV – B}} [O] + [O]$$

$$2O_2 + 2\,[O] \rightarrow 2O_3 + \text{তাপ}$$

আবার যেসব আলট্রাভায়োলেট রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব বেশি (মূলত UV – A) তারা ওজোনকে ভেঙে আবার অক্সিজেন অণু (O_2) ও অক্সিজেন পরমাণু (O) সৃষ্টি করে।

$$O_3 \xrightarrow{\text{UV A}} O_2 + (O)$$

এভাবেই দিবালোকে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন থেকে ওজোন উৎপন্ন হয় এবং তার বিয়োজন হয় ও পুনরুৎপাদন হয়। প্রতিদিন প্রায় 350,000 মেট্রিকটন ওজোন বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি এবং পাশাপাশি ধ্বংসে হচ্ছে। ফলে ওজোনের গাঢ়ত্ব এই গতিশীল সাম্যাবস্থায় প্রায় স্থির থাকে।

তা ছাড়া উপরের বিক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে সূর্য থেকে বিকিরিত অতিবেগুনি রশ্মির অধিকাংশই এই ওজোনস্তরে আটকে যাচ্ছে নানা কারণে, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে এই অতিবেগুনি রশ্মি আসতে পারছে না। অন্যভাবে বলা যায় ওজোন স্তর একটি ছাতার মতো আমাদের পৃথিবীকে অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। তাই একে বলা হয় পৃথিবীর ছাতা (Umbrella of the earth)।

এখন প্রশ্ন হল এই ওজোন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের অন্যত্র পাওয়া যায় না কেন, কিংবা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সর্বত্র সমান ঘনত্বে বিরাজ করে না কেন?

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সর্বত্র ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সমান নয়। নিম্ন ও মধ্য স্তরে (15 – 35 কিমি) ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের এই অসমবন্টনের মূল কারণ ওজোন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তের তারতম্য। প্রকৃতপক্ষে ওজোনের ঘনত্ব বা পরিমাণ নির্ভর করে ইউভি সি এবং অক্সিজেন অণুর ঘনত্বের উপর। সর্বাধিক ওজোন উৎপন্ন হয় যখন ইউ ভি সি এবং অক্সিজেন অণুর ঘনত্বের গুণফল সর্বাধিক হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চ স্তরে

10^{-9}m = 1 nm (Nanometer)

(35 – 50 কিমি) ইউ ভি সি-এর ঘনত্ব কম থাকে কিন্তু ইউ ভি বি-এর পরিমাণ বেশি থাকে অর্থাৎ বায়ুস্তর পাতলা থাকে। ফলে অক্সিজেনের বিয়োজনে উৎপন্ন অক্সিজেন পরমাণুর ঘনত্ব বেশি থাকে এবং অবিয়োজিত আনবিক অক্সিজেনের (O_2) পরিমাণ কম থাকে। এই আনবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব কম হওয়ার কারণে পারমাণবিক এবং আনবিক অক্সিজেনের সংঘর্ষে উৎপন্ন ওজোনের পরিমাণ এই স্তরে অপেক্ষাকৃত কম হয়।

আবার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যস্তরে (15 – 35 কিমি) ইউ ভি-বি-এর পরিমাণ কম থাকে। ফলে আনবিক অক্সিজেনের পরিমাণ পারমাণবিক অক্সিজেনের চেয়ে বেশি থাকে এবং বিক্রিয়ায় বেশি ওজোন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ঘনত্ব হয় সর্বাধিক। কিন্তু নিম্নস্তরে (20 – 25 কিমি) ইউ ভি-বি-এর পরিমাণ এতই কম থাকে যে যথেষ্ট সংখ্যক পারমাণবিক অক্সিজেন উৎপন্ন হতে পারে না। ফলে ওজোন গ্যাসও উৎপন্ন হয় খুবই কম।

4.4.2 বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের গুরুত্ব (Importance of ozone layer in the atmosphere)

ভূপৃষ্ঠে ওজোন গ্যাস একটি পরিবেশ দূষক পদার্থ হিসাবে কাজ করলেও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজন পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। ওজনের একটি পাতলা স্তর সূর্যকিরণ থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির বেশির ভাগ অংশকেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আটকে দেয়। অর্থাৎ ওজোন স্তর পৃথিবীর জীব পরিবেশের প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বা ছাতা হিসাবে কাজ করে। কোনো কারণে ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরি হলে পৃথিবীতে ক্ষতিকারক ইউ ভি বি রশ্মির আগমন ঘটবে। ফলে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মনে রাখা দরকার পৃথিবী সৃষ্টির বহু কোটি বছর পর পৃথিবীতে প্রাণ এসেছিল মূলত অক্সিজেন হীন, ওজোনস্তর হীন বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের জন্য। অগভীর সাগরের তলদেশে প্রথম প্রাণ এসেছিল, কারণ তল অতিবেগুনি রশ্মি আটকে দেয়। পরবর্তীকালে স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদের আবির্ভাবে বাতাসে অক্সিজেন জমে ওজোন স্তর সৃষ্টি করেছিল। তারপরই জৈববিবর্তনে পৃথিবীতে প্রাণের সমারোহ এসেছিল।

সুতরাং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর ক্ষমতা ভয়ংকর। আর এই ওজোন স্তরের সামান্য এক শতাংশ ক্ষয় ঘটলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষতিকারক ইউ ভি-বি-র মাত্রা বা তীব্রতা দুই শতাংশ বেড়ে যায়। এখন দেখা যায় এই ইউ ভি-বি রশ্মি জীবজগতের কী কী ক্ষতি করতে পারে।

● (1) জীবদেহে কার্বন-কার্বন, কার্বন-হাইড্রোজেন, অক্সিজেন-হাইড্রোজেন ইত্যাদি বন্ধন (Bond) রয়েছে। বেশির ভাগ রাসায়নিক বন্ধন ভাঙতে শক্তি লাগে মোটামুটি $6{\cdot}95 \times 10^{-19}$ জুলের মত। 200 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় (যেখানে UV-B-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 280 – 315 nm) রশ্মির শক্তিমাত্রা প্রায় $9{\cdot}93 \times 10^{-19}$ জুল প্রতি ফোটনে। সুতরাং অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে জীবদেহের যে-কোনো রাসায়নিক বন্ধন সরাসরি ভাঙতে সক্ষম। ফলে জীবদেহে নানারকম বিপত্তির সৃষ্টি হয়।

● (2) অতি অল্পবয়সেই চোখে ছানি (eye cataract) পড়তে পারে। তথ্য বলে ইউ ভি বি রশ্মির তীব্রতা যদি 10 শতাংশ বাড়ে তাহলে 50 বছরের কম বয়সের মানুষের চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনা অন্তত 6 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

● (3) ত্বকের উপর নানারূপ ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে এই ইউ ভি-বি রশ্মি। অল্প বয়সেই ত্বক কুঁচকে বয়স্ক মানুষের মতো হতে পারে। কখনে কখনো ত্বক পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে (Suntan)। তা ছাড়া ইউ ভি বি রশ্মি ত্বকের ক্যানসার (Cancer) ঘটাতে সক্ষম। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় ম্যালিগনেন্ট ত্বক ক্যানসারের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে দায়ী করেছেন।

● (4) ইউ ভি বি রশ্মির দীর্ঘকালীন প্রভাবে মানুষের অনাক্রমতা (immunity) কমে। ফলে মানুষ খুব সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

● (5) গাছের পাতার সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া ইউ ভি-বি রশ্মির প্রভাবে সরাসরি উদ্ভিদের পাতা, ফল এবং বীজের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

● (6) সমুদ্রের এককোশী উদ্ভিদ এবং মাছের একমাত্র খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র যেমন নষ্ট হবে তেমনি মাছের উৎপাদনও অস্বাভাবিক কম হবে।

4.4.3 বর্তমান বায়ুমণ্ডলে ওজোনের অবস্থা (Present condition of ozone in the atmosphere)

আমরা আগেই জেনেছি ওজোন গ্যাস মাপবার জন্যে যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে ডবসন একক (Dobson Unit) বলে। সাতের দশকের প্রথম দিকে ওজোন মণ্ডলে ওজোনের এই পরিমাণ ছিল 220 ডবসন। বিজ্ঞানীরা প্রথম অ্যান্টার্কটিকায় আকাশে ওজোনস্তর পাতলা হয়ে আসছে ধরতে পারেন 1985 তে। ওই সময় ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ড. জে সি ফারমেন এবং তার সহকর্মীরা অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন হোল দেখতে পান। দেখা যায় ওই অঞ্চলে ওজোনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 120 – 125 ডবসনের মতো। প্রথম দিকে এই নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। কারণ এসব অঞ্চলে মানুষের বসবাস নেই। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে দক্ষিণ গোলার্ধের মতো উত্তর গোলার্ধেও ওজোনস্তরও পাতলা হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পৃথিবীর নানাস্থানে কম বেশি ওজোনস্তরের ক্ষয় লক্ষ করা যাচ্ছে।

4.4.4 অ্যান্টাকর্টিকায় ওজোনছিদ্র (Ozone hole over Antarctica)

1970-এর পর থেকে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকার ওজোনস্তর অতি দ্রুত পাতলা হচ্ছে। বিজ্ঞানী ফারমেন একে অ্যান্টার্কটিক ওজোন হোল (Antarctic ozone hole) নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতি বসন্তে (ওই সময় অ্যার্ন্টাকটিকায় বসন্তকাল) প্রায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম আয়তনের এক মহাছিদ্র অ্যান্টার্কটিকার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে সৃষ্ট হয় এবং তা আশে পাশের দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। 1993 সালে অক্টোবরের প্রথমে ওজোন ঘনত্ব নেমে আসে সর্বাধিক 90 ডবসনে। বর্তমানে এই মাত্রা আরও কমেছে। অর্থাৎ অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন ক্ষয়ের পরিমাণ গড়ে 50 – 60 শতাংশ। 2000 খ্রিস্টাব্দে NASA-র বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে যে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ওপরের ওজোন স্তর প্রায় 3 কোটি বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে এক বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

4.4.5 ওজোন গর্ত সৃষ্টির কারণ (Causes of ozone depletion)

বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু কোনো কারণে ওজোনের সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের হার বেশি হলে স্বাভাবিকভাবে ওজোনস্তর ক্রমশ পাতলা হবে, ফলস্বরূপ তৈরি হবে **'ওজোন হোল' (Ozone hole)**। কিন্তু এই ওজোন ক্রমশ কমে যাবার কারণ কী? এর কারণ হিসাবে রসায়নবিদরা যে সব তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্লোরিন দৃষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সবচেয়ে আদর্শ জায়গা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।

অ্যান্টার্কটিকায় 6 মাস শীতকাল থাকে। ওই সময় প্রচণ্ড ঠান্ডায় শীতকালীন তাপমাত্রা নেমে যায় –88°C পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মে তা আবার 11° C পর্যন্ত ওঠে। শীতকালে তাই এই নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় সমস্ত দূষক গ্যাস জমাট বেঁধে কেলাসাকারে পোলার স্ট্র্যাটোস্ফিরিক মেঘে (Polar stratospheric elouds – PSC) পরিণত হয়। এই সময়

জমাট বাঁধা প্রধান দূষক গ্যাসগুলি হল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl), জলীয় বাষ্প (H_2O), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2) এবং ক্লোরিন নাইট্রেট ($ClONO_2$)। এই অবস্থায় HCl এর সঙ্গে $ClONO_2$ এর বিক্রিয়ায় ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রচণ্ড শীতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচের দিকে সঞ্চিত হয়।

বসন্তের শুরুতে (সেপ্টেম্বর অক্টোবরে) সূর্য কিরণের আবির্ভাব হয় এবং ক্লোরিন অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন পরমাণুতে পরিণত হয় (Cl) যা প্রবল বিক্রমে অনুঘটকীয় ক্রিয়াবিধিতে ওজোন স্তরের ক্ষয় করে চলে। তৈরি হয় 'ওজোন হোল' বা ওজোন গর্ত।

বিক্রিয়া ঃ

(i) বসন্তের বায়ুমণ্ডলে অক্সিক্লোরাইড মূলক উৎপাদন ঃ $Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$

(ii) অক্সিক্লোরাইড মূলক নিস্ক্রিয়করণ ঃ $ClO^{\bullet} + NO_2 + M \rightarrow ClONO_2 + M$ (M = অনুঘটক)

(iii) বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন (HNO_3) ঃ

$$ClONO_2 + H_2O \rightarrow HOCl + HNO_3$$

(iv) প্রাক্ বসন্তের আলোয় পারমাণবিক ক্লোরিন উৎপাদন ঃ

$$HOCl \xrightarrow{UV-B} HO^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

$$Cl_2 \xrightarrow{UV-B} Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

(v) বসন্তের শুরুতে ওজোন ক্ষয় শুরু ঃ $O_3 + Cl^{\bullet} \quad ClO + O_2$

(vi) আবার একইভাবে ClO থেকে $ClONO_2$ উৎপন্ন হয় এবং এভাবেই চলে এক শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain reaction)।

4.4.6 ওজোনস্তর ক্ষয়ে ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগের ভূমিকা (Role of CFCs in O_3 depletion)

ওজোনস্তর ধ্বংসকারী ক্লোরিন পরমাণুর প্রধান উৎস হচ্ছে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন বা সি এফ সি (Chloro-fluro carbon – CFC) যৌগ। এই রাসায়নিক পদার্থ ফ্রেয়ন (Freon) গ্যাস নামে পরিচিত, এরা তিন প্রকারের । যথা, ফ্রেয়ন 11 বা $CFCl_3$, ফ্রেয়ন 12 বা CF_2Cl_2 এবং ফ্রেয়ন 113 বা $CF_2Cl – CFCl_2$। এরা বায়ুমণ্ডলের তলার দিকে রাসায়নিক বিক্রিয়া খুব একটা করে না। কিন্তু ওপরের দিকে অতিবেগুনি রশ্মির (UV - Ray) প্রভাবে এরা ভেঙে ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে যা ওজোনস্তর ভাঙতে সক্ষম।

$$CF_2CL_2 \xrightarrow{UV-C} CF_2Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

$$Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$$

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিনের বর্তমান ঘনত্ব 3·5 ppb যা ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় প্রায় 6 গুন বেশি। এই ভয়ংকর অবস্থার কারণ সাতের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত গড়ে প্রতিবছর বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত সি এফ সি-র পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ান টন। বিজ্ঞানীরা আরও হিসেব করে দেখেছেন যে সি এফ সি তৈরি হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 2 কোটি মেট্রিক টন সি এফ সি বায়ুমণ্ডলে মিশেছে। সুতরাং এখন যদি সি এফ সি উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় তাহলেও বর্তমান শতকের শেষপর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ স্বাভাবিক হবে না।

এখন প্রশ্ন হল এই সি এফ সি কোথা থেকে আসছে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সি এফ সি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ফ্রিজ ঠান্ডা হবার জন্য সি এফ সি লাগে। এয়ারকন্ডিশনারে আছে সি এফ সি। বিছানার বা সোফার গদির

প্লাস্টিক ফোম তৈরিতে সি এফ সি ব্যবহৃত হয়। ঘরের বাতাস সুবাসিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্প্রের মূল উপাদান সি এফ সি। এ ছাড়াও নানা শিল্পে সি এফ সির ব্যবহার আছে (সারণী 4.4)।

সারণি 4.4 ঃ বিভিন্ন সি এফ সি যৌগ ও তাদের ব্যবহার

সি এফ সি	সংকেত	প্রধান ব্যবহার
সি এফ সি – 11	CF_2Cl_2	রেফ্রিজারেটর গাড়িতে ব্যবহৃত নরম ফোম, স্প্রে ক্যান, নরম কার্পেট
সি এফ সি – 12	CF_2Cl_2	রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, কঠিন প্লাস্টিক নির্মাণ, বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যে
সি এফ সি – 113	$CF_2Cl - CFCl_2$	গ্রিজ, গ্লু ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সারকিট নির্মাণে।

4.4.7 অন্যান্য ওজোন ধ্বংসকারী যৌগ (Other O_3 destructing elements)

l (i) সি এফ সি ছাড়াও হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (H_2O_2) ওজোন স্তর হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ধারণ করে।

ঊর্ধ্বাকাশে মিথেন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি ভেঙে যায় এবং মিথেন ভেঙে মিথাইল মুক্ত মূলক ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ভেঙে যায় জায়মান অক্সিজেন এবং হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক তৈরি করে। তা ছাড়া জায়মান অক্সিজেন জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করেও হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক গঠন করে। এই হাইড্রোক্সিল আয়ন ওজোন অণুকে ভেঙে তৈরি করে হাইড্রোপার অক্সাইড ও অক্সিজেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রায় 11 শতাংশ ওজোন হ্রাসের এটাই সম্ভাব্য কারণ।

বিক্রিয়া ঃ

(i) $$\underset{\text{মিথেন}}{CH_4} \xrightarrow{\text{UV-B}} \dot{C}H_3 + \dot{H}$$
মিথাইল মুক্ত মূলক + হাইড্রোজেন মুক্ত মূলক

$$\dot{C}H_3 + O_3 \rightarrow CH_3\dot{O} + O_2$$
মিথাইল মুক্ত মূলক + ওজোন → মিথক্সি + অক্সিজেন

(ii) $$H_2O_2 \xrightarrow{\text{UV – B}} 2H\dot{O}$$
হাইড্রোজেন পার অক্সাইড → হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক

$$H_2O_2 \longrightarrow [O] + H_2O$$
হাইড্রোজেন পার অক্সাইড → জায়মান অক্সিজেন + জল

$$H_2O + [O] \longrightarrow 2H\dot{O}$$
হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক

$$H\dot{O} + O_3 \longrightarrow O_2 + H\dot{O}_2$$
হাইড্রোক্সিল মুক্ত + ওজোন মূলক → অক্সিজেন + হাইড্রোপার অক্সাইড মুক্ত মূলক

➠ (ii) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রিক অক্সাইড ওজোনকে অক্সিজেনে ভেঙে দেয়। এখনই এই অক্সাইড বিভিন্ন কারণে বায়ুমণ্ডলে আসে। তারমধ্যে অন্যতম হল বিমানের জ্বালানি তেল পোড়ার ফলে উৎপন্ন হয় এই অক্সাইড যা ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রায় 9–13 কিমি মধ্যে দীর্ঘ সময় ভেসে থাকতে পারে। এই অক্সাইড যখন আরও ঊর্ধে ওজোনের সংস্পর্শে আসে তখন বিক্রিয়ায় ওজোন অণু ভেঙে যায়— ফলে পাতলা হতে থাকে ওজোনস্তর।

বর্তমানে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে সুপার সোনিক ও হাইপারসোনিক প্লেন চালানোর ফলে এই ক্ষতির সম্ভাবনা আরও বাড়ছে।

$$NO_2 \xrightarrow{UV-B} NO + [O]$$

নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড → নাইট্রিক অক্সাইড + জায়মান অক্সিজেন

$$NO + O_3 \longrightarrow NO_2 + O_2$$

নাইট্রিক অক্সাইড + ওজোন → নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড + অক্সিজেন

4.4.8 ওজোন বিনাশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Measures to protect O_3 depletion)

➠ (i) প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যে প্রথম বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ নেওয়ার উদ্যোগে 1970-এ স্টকহোম বৈঠক সি এফ সি উৎপাদন ও ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা শুরু হয়। প্রথম স্ক্যান্ডেনিভিয়ান দেশসমূহ সুগন্ধি অ্যারোসল উৎপাদনে সি এফ সি যৌগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে যথারীতি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে সি এফ সির উৎপাদন কমার বদলে বেড়েই চলল। এর পরে 1987 (মন্ট্রিয়াল), 1990 (লন্ডন) ও 1992 (কোপেনহাগেন)তে আবার উদ্যোগ শুরু হয়, এবং ঠিক হয় 1995 - এর মধ্যে সমস্ত উন্নত দেশে সি এফ সি এবং হ্যালোন উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হবে। সেই সঙ্গে কার্বন টেট্রোক্লোরাইড (CCl_4) এবং মিথাইল ক্লোরোফর্ম (CH_3CCl_3) এর উৎপাদন ধারাবাহিক ভাবে কমিয়ে আনতে সকলেই সম্মত হয়। সম্মেলনে আরও বলা হয় এই সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হলে 1995 – 2005 সাল অবধি বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিনের ঘনত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না, 2005 সালের পরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ক্লোরিনের ঘনত্ব হ্রাস পাবে। এবং এই ক্লোরিনের ঘনত্ব 2ppb-এ নেমে না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় 2075 সাল পর্যন্ত নিয়মিত ওজোন হোল দেখা যাবে অ্যান্টার্কটিকায়।

➠ (ii) সারা পৃথিবী জুড়ে অপর যে পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে তা হল সি এফ সি প্রতিস্থাপনযোগ্য বিকল্প পদার্থের সন্ধান। CFC – 11 ও CFC – 12-এর বিকল্প হিসাবে যে সব রাসায়নিক যৌগ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হল HCFC – 123, HCFC – 123a, HCFC – 141b, HCFC – 22, HFC – 134a ইত্যাদি। এগুলি ক্লোরিনবিহীন হওয়ায় ওজোন বিনাশের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলে এরা ক্ষণস্থায়ী। সর্বোপরি আরও কতগুলি প্রযুক্তি বা বিকল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি প্রচলিত হলে বায়ুমণ্ডলে সি এফ সি গ্যাস অবাধে মেশাবার পরিমাণ অনেক কমবে।

➠ (iii) কীটনাশক স্প্রে, ক্লীফ, এজেন্ট প্রভৃতির ক্ষেত্রে এতদিন সি এফ সির বহুল প্রচলন ছিল। বর্তমানে অন্যান্য হাইড্রোকার্বন দিয়ে এই কাজ করার চেষ্টা উন্নত দেশগুলোতে শুরু হয়েছে। ফুড প্যাকেজ তৈরিতে মোমের বদলে পিচবোর্ড বা খড়ের মণ্ড থেকে তৈরি বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। তাপনিরোধক পদার্থ হিসাবে সি এফ সির বদলে ফাইবার গ্লাসের আরও প্রচলন বাড়ানো যেতে পারে। তবে এখনও সি এফ সির তুলনায় এই সমস্ত প্রযুক্তি অনেক বেশি দামি এবং সেই কারণে দরিদ্র দেশসমূহের পক্ষে এই সমস্ত প্রস্তাব মানা খানিকটা অসুবিধাকর। তা সত্ত্বেও আমাদের এই সব ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে হবে। যদি পৃথিবীর সর্বত্র সি এফ সি কিংবা হ্যালন উৎপাদন বন্ধ করে

দেওয়া যায় তাহলে ইতিমধ্যে যে বিপুল পরিমাণ ওজোনস্তরের ক্ষয় হয়েছে তা পূরণ করতে অনেক সময় লাগবে।

4.5. অম্লবৃষ্টি ঃ উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব (Acid Rain)

অম্ল বৃষ্টির উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

উৎস	ক্ষতিকারক প্রভাব
● বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও ভাসমান ধূলিকণাগুলি জলের সঙ্গে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং সারফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করে। ● কয়লা, খনিজতেল প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফার (S) ও কার্বন-মনোক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সঠিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নাইট্রোজেন ও সালফার ঘটিত অক্সাইডগুলি আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরি করে। ● নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর সঙ্গে মিশে অম্লবৃষ্টি ঘটায়। অম্লবৃষ্টি তৈরির রাসায়নিক সমীকরণ হল— (ক) সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) + জলীয়বাষ্প (H_2O) সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) (খ) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) + জলীয়বাষ্প (H_2O) নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2)	● জলধারাগুলি জল দূষিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হ্রাস করে। ● ঘরবাড়ি, স্থাপত্যশিল্পে, মনুমেন্ট, স্মৃতিসৌধ ও অট্টালিকার ক্ষতি সাধিত হয়। ● জলধারাগুলির জলদূষিত হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি হ্রাস করে। ● অরণ্যের উদ্ভিদ ধ্বংস করে। ● মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে। ● অম্লধর্মী মৃত্তিকার বিভিন্ন ধাতু (তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি) মাটির গভীরে ঢুকে জলকে দূষিত করে। ● উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ● অম্লবৃষ্টিতে দুই রকমের অ্যাসিড তৈরি হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডগুলি শ্বাসনালিতে ও ফুসফুসে নানা রোগ সৃষ্টি করে। এমনকি এর প্রভাবে ফুসফুসে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এ ছাড়াও পরিপাকতন্ত্র ও নার্ভতন্ত্রেরও ক্ষতি সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মথুরার কাছে তৈলশোধনাগার থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) ও অন্যান্য গ্যাস নির্গত হয়ে চলেছে যা জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড তৈরি করে। ফলে তাজমহলের মার্বেল পাথরে নানারকম ক্ষয় দেখা যাচ্ছে।

4.6. এলনিনো (El Nino)

স্প্যানিশ ভাষায় এলনিনো শব্দের অর্থ হল শিশু যিশুখ্রিস্ট (Christ Child)। এই বিপর্যয় ডিসেম্বর মাসে বড়োদিনের সময় (Around Christmas) হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের চিলি-পেরু সংলগ্ন উপকূল বরাবর মাঝে মাঝে অস্থির ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির দক্ষিণমুখী উষ্ম সমুদ্রস্রোতের আগমনই এলনিনো নামে পরিচিত। এই উষ্ম স্রোত কখন শুরু হবে, কখন শেষ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-পশ্চিমে উষ্মতা ও স্রোতের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পাপুয়া, নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে জল বেশ গরম থাকে, অপর পক্ষে পূর্ব দিকে অর্থাৎ ইকুয়াড়ের, পেরু, চিলি প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের জল বেশ শীতল থাকে। এর কারণ সম্ভবত এই অংশে সারাবছর উত্তরগামী শীতল পেরু স্রোত বয়। ফলস্বরূপ পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্বঅংশে তাপমাত্রা অন্তত 5° সেঃ কম থাকে। স্বাভাবিক নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠেও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে দুটি স্রোত নিরক্ষরেখার দুদিকে বহিঃস্রোত (Surface current) রূপে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। একই সঙ্গে ফাঁকা স্থানের কারণে পূর্বদিকের সমুদ্রের গভীর থেকে ঠান্ডা জল উপরিতলে উঠে আসে। এই নীচ থেকে উঠে আসা ঠান্ডা জলের সঙ্গে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাঙ্কটন— যা মাছের একমাত্র খাদ্য। তাই এই উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। পেরু, চিলি প্রভৃতি দেশ তাই সামুদ্রিক মৎস্য বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নত।

এই স্বাভাবিক ঘটনার পরিবর্তন হলে এলনিনো বিপর্যয় দেখা যায়। কোনো কোনো বছর পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে বয়ে যাওয়া আয়ন বায়ুর গতি কমে আসে। এবং প্রচণ্ড গতিতে উলটোদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের উষ্ম জল পূর্বদিকে বইতে শুরু করে। ফলে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের জল শীতল হওয়ার বদলে বেশ গরম হয়ে উঠে। এই স্রোতের তাপমাত্রা বেশি থাকে বলে তখন আর প্ল্যাঙ্কটন সহ পুষ্টিকর পদার্থ নীচ থেকে উপরে আসে না ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্রে দেখা যায় গভীর বিপর্যয় এবং অধিক তাপমাত্রা ও খাদ্যের অভাবে প্রচুর পরিমাণ মাছ মারা যায়। কখনো কখনো এই ঘটনা একবৎসর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই অঞ্চলের মৎসচাষ কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়।

গরম এই সমুদ্রস্রোত নিম্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় এবং অস্থায়ী নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। ফলে উপকূল অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়ার গতি বেড়েই চলে যা উত্তর আমেরিকার উপকূল অঞ্চলকেও আঘাত করে। এর সাথে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়ে। এই ঘটনা বায়ুমণ্ডলীয় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় বলে বিজ্ঞানীরা একে এলনিনো-দক্ষিণী ওঠাপড়া (El Nino - Southern oscillation বা ENSO) বলেন। দক্ষিণী ওঠানামা বা ENSO হলেই ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে বায়ুচাপ বাড়ে এবং বৃষ্টিপাত কমে। কখনো কখনো এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এতই কমে যে উত্তর অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্বাভাবিক খরা সৃষ্টি হয়। ভারতের মৌসুমি বায়ু প্রবাহও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বৃষ্টিপাত কমে। তবে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ঊর্ধ্বাকাশের জেট বায়ুপ্রবাহ শক্তিশালী হয়। সেই কারণে ENSO অবস্থায় সারা পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়ার (বিশেষত বৃষ্টিপাতের) এক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

সাম্প্রতিককালে 1982-83, 1986-87 এবং 1997-98 সালে প্রবলভাবে এলাবিনো দেখা দিয়েছিল। ঠিক কত বছর অন্তর এই স্রোত দেখা যায় তা সঠিক ভাবে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেননি, তবে তথ্য অনুসারে প্রতি 3–10 বছরে এক একটি ভয়াবহ ENSO অবস্থা আসে। গত 1979-তে ENSO শুরু হয়েছিল এপ্রিল-মে মাসে এবং জুন মাসে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছেছিল। এটি প্রায় 1998-এর এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তবে 1982-83 এর ENSO অবস্থা বিশ্ব শতাব্দীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল।

4.7. লা নিনা (La Nina)

এলনিনোর ঠিক বিপরীত অবস্থাকে বলে লানিনা। স্প্যানিশ শব্দ লা নিনার অর্থ হলো ছোট্ট বালিকা (young girl)। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে শীতল বায়ুপ্রবাহ হবার ঘটনা লা নিনা নামে পরিচিত। প্রাশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে আয়ন বায়ু শক্তিশালী হলে পেরু ও ইকুয়েড়র উপকূলে নীচ থেকে শীতল প্ল্যাঙ্কটন সমুদ্র জলস্রোত উপরে আসে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে ENSO শীতল অবস্থা (Cold phase) বলে। লানিনা হলে উলটোভাবে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তথা ইন্দোনেশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ভালো বৃষ্টি হয়। ভারতের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহও স্বাভাবিক থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এলনিনো - লানিনা হল ENSO চক্রের দুটি চরম অবস্থা। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিকিরণজনিত তাপ সমতার বিঘ্ন ঘটালে (Variation of radiational heat budget) এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী গিলবাট ওয়াকার (Gilbert Walker) প্রথম এই পেন্ডুলিয়ামের দোলনসম তাপমাত্রার চরম অবস্থার চক্রাকার প্রবাহের পরিচিতি ঘটান। তাই একে ওয়াকার প্রবহন (Walker circulation) বলে।

4.8. বৃক্ষছেদন (Deforestation)

পৃথিবীর বনাঞ্চলগুলি মানুষের কাছে অশেষ মূল্যবান। কারণ এগুলি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং পরিবেশের সঠিক মান সংরক্ষণ করে। দেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতর অংশের মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটায়। প্রাচীন যুগে যেমন অস্ত্র থেকে শুরু করে মানুষ খাদ্যপ্রস্তুতি, শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করা, বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে কাঠ ব্যবহার করত, তেমনি আধুনিক যুগেও কাগজশিল্প, জ্বালানি, আসবাব নির্মাণ, ওষধি ইত্যাদি কাজে অরণ্যসম্পদ মানুষ ব্যবহার করে। এ ছাড়াও ভূমি সংরক্ষণ, আবহাওয়া ও পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অরণ্য ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যে সারা পৃথিবীতে অরণ্যভূমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নগরায়ণের প্রয়োজন মেটাতে অবাধে বৃক্ষছেদন এবং বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। বিকাশশীল দেশগুলিতে শিল্পস্থাপন, রাস্তাঘাট তৈরির প্রয়োজনেও বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে বনদপ্তরের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1952 থেকে 1972-এর মধ্যে প্রায় 3·4 মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি নদীবাঁধ তৈরি, নতুন চাষের জমি, রাস্তা ও শিল্পায়নের জন্য নষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ বছরে প্রায় 0·15 মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে এবং একই হার থাকলে 20 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বনভূমি লোপ পাবার আশঙ্কা রয়েছে। বনভূমি ধ্বংসের মতো হঠকারিতার ফলে ভূমির অবনমন ঘটছে; মৃত্তিকার ক্ষয় বেড়ে গিয়ে কমে গেছে জমির উর্বরতা। বন্যা ও খরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল এইসব কাজকর্মের পরিণতি।

তাই যথেষ্ট পরিমাণ নতুন বনসৃজনই বন নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। মানুষের ব্যক্তিগত জমিতে, রেললাইন বা রাস্তার ধারে, নদীবাঁধ বা পুকুর পাড়ের খালি জমিতে সর্বত্রই বৃক্ষরোপণ করা যেতে পারে। এভাবে সুপরিকল্পিতভাবে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তন করা যায়, তেমনই বিশেষ ধরনের বৃক্ষরোপণের সাহায্যে সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহ ও অর্থকরী সম্পদের ব্যবস্থাও করা যায়।

4.9. পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movement)

পরিবেশ সম্পর্কীয় সমস্যাগুলি অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরনের। প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং সীমিত ক্ষেত্রে

পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। যে সাহস, শক্তি এবং ধৈর্যের পরিচয় এই আন্দোলনগুলিতে স্থানীয় সাধারণ মানুষ দেখিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়, কয়েকটি অন্যতম পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে পরিচিতি খুবই প্রয়োজন।

4.9.1 চিপকো আন্দোলন

1972 সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশে তেহরী গাড়োয়াল অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। 'চিপকো' কথাটির অর্থ 'আলিঙ্গন'। বিত্তবান ঠিকাদার এবং শিল্পপতিদের নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস এবং বনসম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। রাতের অন্ধকারে ঠিকাদারের লোকেরা গাছ কাটতে এলে আদিবাসী মায়েরা প্রতিটি বৃক্ষকে সন্তানের মতো জড়িয়ে থাকেন। রাতের পর রাত জেগে গাছ পাহারা দিয়েছেন এই মহিলারা। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরলা বেন, মীরা বেন, সুন্দরলাল বহুগুণা, চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভাট ইত্যাদি পরিবেশবাদীরা। বহুগুণার নেতৃত্বে শ্রীনগর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 300 কিমি পদযাত্রা করা হয়। তিনি পরবর্তীকালে অনশনেও বসেন। এগারো দিনের মাথায় বহুগুণাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খবর পেয়েই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে এবং তার চাপে পুলিশবাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের তীব্রতা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নজরও কেড়েছিল।

ভারতের অন্যান্য প্রান্তের বিভিন্ন অধিবাসীরা এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে সাঁওতাল পরগণা, ছত্তিশগড়, থানে এবং আরাবল্লী অঞ্চলেও আন্দোলন শুরু হয়। কর্ণাটকে এই আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়ে অ্যাপ্পিকো (Appiko) নামক আন্দোলনে পরিণত হয়। বহুমানুষ পদযাত্রা করে কেলসী (Kelase) অরণ্যে গাছকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারের কুঠারাঘাত থেকে তাদের রক্ষা করে। এতে ঠিকাদাররা ভীত হয়ে পড়ে এবং চতুর্দিক থেকে এই আন্দোলন সমর্থনও পায়।

চিপকো আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের জন্য হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ নিধন নিষিদ্ধ করা। কারণ পর্বতে অবস্থিত প্রতিটি উদ্ভিদ হিমবাহ ও ধস না হতে দিয়ে মৃত্তিকা ও সঞ্চিত জলকে রক্ষা করে। বহুগুণার মতে, গাছ আমাদের জ্বালানি বা আসবাবপত্রের কাঠ জোগান দেবার জন্য জন্মায়নি। মৃত্তিকা, জল সংরক্ষণ এবং মানুষকে তার বাঁচার অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য অরণ্যসম্পদ হল ভগবান প্রদত্ত উপহারস্বরূপ। আর একটি দাবিও এই আন্দোলনের ভিতর থেকে জোরদার হয়ে ওঠে— অরণ্যের মূল প্রজাতি বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পশুখাদ্য সংগ্রহ ও হালকা জ্বালানি সংগ্রহে মায়েদের অধিকার থাকবে। তথাকথিত অশিক্ষিত আদিবাসী মহিলাদের পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অরণ্য রক্ষার পাশাপাশি, অরণ্য প্রজাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও সংরক্ষণও তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল।

4.9.2 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

পশ্চিম ভারতের প্রধান নদী হল নর্মদা। দৈর্ঘ্য প্রায় 1450 কিমি। মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে পশ্চিমবাহিনী হয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে। নর্মদার উপত্যকায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম অধিবাসী ভিল, গন্ডদের হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই নদীর স্রোতপথে ও তার উপনদীতে 30টি বড়ো বাঁধ, 135টি মাঝারি বাঁধ ও 3000টি ছোটো বাঁধ তৈরির উদ্দেশ্যে 1985 সালে বিশ্বব্যাংক 45 কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে এবং 1988 সালে পূর্ণমাত্রায় কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বন্যা প্রতিরোধ, নিকটবর্তী তিনটি রাজ্যে প্রায় 50 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করা ও জলসম্পদ থেকে 2700 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা। প্রকল্পের সবচেয়ে বড়ো দুটি বাঁধের একটি গুজরাটে অবস্থিত 'সর্দার সরোবর' এবং অন্যটি মধ্যপ্রদেশের 'নর্মদা সাগর' বাঁধ।

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন বিখ্যাত পরিবেশবিদ মেধা পাটেকর এবং বাবা আমতের নেতৃত্বে হাজার হাজার আন্দোলনকারী। তাদের মতে প্রকল্পের পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার অনেক অসংগতি আছে। বাঁধ

তৈরির ফলে সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর বনভূমি জলমগ্ন হবে এবং 56 হাজার হেক্টর উর্বর কৃষিজমি ধ্বংস হবে। একদিকের বন্যা প্রতিরোধ হলে অন্যদিকে বন্যা দেখা দেবে। মেধা পাটেকরের মতে, প্রকল্পটিতে 50 মেগাওয়াটের বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব না। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে এক মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হবে যাদের বেশির ভাগই গরীব এবং আদিবাসী শ্রেণির। সমৃদ্ধ অরণ্যবৈচিত্র্য লুপ্ত হবে। প্রায় 25টি প্রজাতির পাখির বাসস্থান ধ্বংস হয়ে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া প্রাথমিক ব্যয় 25 হাজার কোটি টাকা ধরা হলেও দিন দিন সেই পরিমাণ এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে সবদিক বিবেচনা করলে প্রকল্পটির রূপায়ণে লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।

1987 সালে বাবা আমতে এই প্রকল্পের সব কথা সাধারণ মানুষকে জানাবার দাবি তোলেন। বাস্তবে তা মানা হয়নি। 1989 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের যে গ্রামগুলি ডুবে যাবার আশঙ্কা তাদের প্রায় দশ হাজার মানুষ জমা হয়েছিলেন প্রকল্পটি রূপায়ণের প্রতিবাদ জানাতে এবং সেই অহিংস মিছিলকে পুলিশ আক্রমণ করে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বর্তমানে এক বিশেষ দিকে মোড় নিয়ে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। 2000 সালের 18 অক্টোবর ভারতের সুপ্রিমকোর্টে তিন সদস্যের বেঞ্চের রায়ে বাঁধ তৈরির পক্ষেই মতামত প্রদর্শন করা হয়েছে। বাঁধ তৈরির জেরে যে হাজার হাজার মানুষের কয়েক প্রজন্মের বাসস্থান ও কর্মস্থল এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি নিমজ্জমান হবে, তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিকেও উপেক্ষা করা হয়েছে। সর্বশেষ রায়ে সুপ্রিমকোর্ট বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়ে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়ায় আবার নতুন করে বিক্ষোভ তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

4.9.3 তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলন

উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশে ভাগীরথী ও ভিলগঙ্গা নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে 260·5 মি. উচ্চ তেহরী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় সোভিয়েত আর্থিক সহয়োগিতায়। এর ফলে 270000 হেক্টর জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা হবে, 640000 হেক্টর জমির বর্তমান সেচব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।

1977 সালে এই বাঁধের কাজ শুরু হলে প্রকল্পটির বিরোধিতায় তেহরী বাঁধ বিরোধী সংগ্রাম সমিতি' গঠিত হয়। তাদের মতে এই বাঁধ নির্মাণের সুফল অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। প্রকল্পটির ফলে 85000 মানুষ গৃহহীন হবে এবং তেহরী শহর ও পার্শ্ববর্তী 100টি গ্রাম জলমগ্ন হবে। জলাধারের বিপুল পরিমাণ জলের চাপে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা ছাড়া হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি ধর্মীয় শহর ধ্বংস হবে এবং বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষিজমি জলে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরলাল বহুগুণা এই বাঁধের বিরোধিতায় বেশ কয়েকবার অনশন করেন।

4.9.4 সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন

এই আন্দোলন ভারতের অন্যতম পরিবেশ আন্দোলন। উত্তর কেরালার পালঘাট জেলার পাহাড়ি অঞ্চল বর্ষণারণ্য আচ্ছাদিত 'সাইলেন্ট ভ্যালি'। দুদিকে কেরালার দুই শহর কোজিকোড় এবং পালঘাট নিয়ে এই উপত্যকার চেহারা অনেকটা ত্রিভুজের মতো। এমন গভীর জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। তাই এর নাম 'সাইলেন্ট ভ্যালী' বা 'নীরব উপত্যকা'। এই উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে চলেছে কুন্তী নদী, এই নদীতে 1973 সালে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন একটি বাঁধ দেওয়ার প্রকল্প ঘোষণা করে। শুরুতে 120 মেগাওয়াট ও পরে 240 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত হয়। বহু পরিবেশবিদ আপত্তি জানান এই প্রকল্প রূপায়ণে। WWF, India-র

একটি ট্রাস্ক ফোর্সের সমীক্ষায় বলা হয়, প্রকল্পটি রূপায়িত হলে ‘the richest expression of life that has evolved on this planet’ ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ছাড়া কেরালার বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) গণসাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এর বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠায় 1980 সালের ডিসেম্বর মাসে কেরালা সরকার এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে, এবং ‘সাইলেন্ট ভ্যালি’কে ‘জাতীয় উদ্যান’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

4.10. জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ এই দুই নিয়ে গঠিত জীবজগৎ। আজ থেকে আনুমানিক 300 কোটি বছর আগে সমুদ্রে প্রথম এই জীবের সৃষ্টি। তারপর স্থলভাগে এবং কালক্রমে সমগ্র বিশ্বে জন্ম নেয় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে পৃথিবীর এই বিশাল জীবজগতের মোট প্রজাতির সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। বিপুল সংখ্যক এই প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে আনুমানিক প্রায় 17 লক্ষ প্রজাতির পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীদের মতে এর চেয়ে অনেক বেশি প্রজাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে।

পৃথিবীর জীবমণ্ডলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এই যে বৈচিত্র্য তাকে জীববৈচিত্র্য বলে। 1992 খ্রিস্টাব্দে বসুন্ধরা সম্মেলনের পরেই জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইর্ভাসিটি শব্দটি বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনটি বিভিন্ন স্তরে জীব বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন করা হয়— জিন (gene), প্রজাতি (species) এবং বাস্তুতন্ত্র (ecosystem)। তবে এই তিনটে স্তরের মধ্যে প্রজাতিই মূল স্তর।

জীববৈচিত্র্য সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন জীবের প্রজাতিভেদে বা প্রজাতি সংখ্যার তারতম্যের কারণে হয়। কিন্তু নানা কারণে এই বৈচিত্র্য আজ নষ্ট হতে চলেছে এবং অনেক প্রজাতি বিপন্ন প্রজাতি স্তরে পৌঁছেছে। যে সমস্ত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মানুষের কোনো ক্ষতিকর কাজের জন্য বিপন্ন হয়েছে অর্থাৎ অবলুপ্ত হতে চলেছ তাকে বিপন্ন প্রজাতি (endangered species) বলে। যেমন সুন্দরবনের সুন্দরী উদ্ভিদ কিংবা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ দীর্ঘদিন বিপন্ন হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিলুপ্তি সাধারণত জলবায়ুর পরিবর্তনে জলভাগ ও স্থলভাগের আয়তন পরিবর্তনে ইত্যাদি কারণে ঘটে। যখন কোনো প্রজাতির সর্বশেষ স্বতন্ত্র জীবটি কোনো বংশধর না রেখে মারা যায় তখন সেই ঘটনাকে প্রজাতির বিলুপ্তি বলে।

প্রায় 70 কোটি বছর পূর্বে প্রিক্যামব্রিয়াম যুগে জীববৈচিত্র্যের সর্বপ্রথম ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটে। তারপর প্রায় 24·5 কোটি বছর পূর্বে পারমিয়ান যুগে মহাদেশগুলোর ওলট-পালট হবার সময় আবার ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটে। এই সময় প্রায় 90 শতাংশেরও বেশি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। তারপর ট্রিয়াসিক (19·5 কোটি বছর পূর্বে), ক্রিটেসিয়াস (6·6 কোটি বছর পূর্বে) যুগেও বহু স্থলবাসী উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটে।

4.10.1 ভারতের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity in India)

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের বিশাল ভান্ডার খুব অল্পই আমরা জানি। একথা সমানভাবে ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও ভারত জৈববৈচিত্র্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এর কারণ সম্ভবত একই ভারতে একাধিক অনুকূল পরিবেশের সহাবস্থান। উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে মরুভূমি, দক্ষিণে বিশ্বের প্রাচীনতম মালভূমির অংশ আবার দক্ষিণপূর্বে নবীনতম সমভূমি সমৃদ্ধ বৃহত্তম বদ্বীপ। ফলে ভারতে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা কম নয়। ধান, পাট, নীল, কার্পাস, শশা, গোলমরিজ, মিলেট ইত্যাদির উৎপত্তিস্থল এই ভারতবর্ষ। এদের অসংখ্য বন্য প্রজাতিও ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতিতে।

আবার অগ্ন্যুৎপাত, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, তুষারপাত ইত্যাদি কারণে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটেছে।

1978 সালে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (BSI) রেড ডাটা বুক (Red Data Book) প্রকাশ করে। এই বইতে ভারতের লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক এদের সংখ্যা 1500। এদেরকে বাদ দিলেও ভারতে মোট উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় 45000 এর মধ্যে সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা মাত্র 15000। নীচে পৃথিবীর মোট প্রজাতির সঙ্গে ভারতের প্রজাতিসংখ্যার একটি তুলনা করা হল।

সারণি 4.5 ঃ ভারতের জীববৈচিত্র্য

জীবগোষ্ঠী	*ভারতের প্রজাতি*	*পৃথিবীর মোট প্রজাতির শতাংশ হার*
1. মোট উদ্ভিদ	45000	11.10
2. পতঙ্গ শ্রেণির	50,000	6.13
3. শামুখ জাতীয়	4000	7.59
4. অন্যান্য অমেরুদণ্ডী	6500	9.56
5. মাছ	2400	11.72
6. উভচর	140	3.96
7. সরীসৃপ	420	7.85
8. পাখি	1200	7.85
9. স্তন্যপায়ী	1340	8.03

উৎস ঃ National Action Plan on Biodiversity (1997), Govt. of India

এই তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির 11.10 শতাংশ এবং প্রাণী প্রজাতির 6.67 শতাংশ ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ জৈববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল উদ্ভিদকূল। দেশোদ্ভূত (endemic) প্রজাতির মধ্যে সংখ্যার অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার পর ভারতের স্থান। ভারতবর্ষের কয়েকটি উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যায় ভার...... অঞ্চল হল উত্তর-পূর্ব ভারত, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা, উত্তর পশ্চিম হিমালয় ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। মনে রাখা দরকার এদের মধ্যে অন্তত দুটি অঞ্চল— পূর্ব হিমালয় ও পশ্চিমঘাট ইতিমধ্যে বিশ্বের 18টি Hot spot এর তালিকায় অন্তর্গত।

প্রাণী বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ও আমরা পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র কীটপতঙ্গের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 50,000 প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা কম করে 1200। ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে এই ধরনের প্রজাতির প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। — যেমন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমঘাট মধ্যভারত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সরীসৃপদের সবচেয়ে বেশি অবস্থান ভারতে দেখতে পাওয়া যায়। দেশোদ্ভূত উভচর প্রজাতির প্রায় 85% পাওয়া যায় আমাদের দেশে। ভারতের পৃথিবীর সর্বাধিক গৃহপালিত পশু বর্তমান। এখানে কম করে 26টি জাতের গোরু, 40টি জাতের মেষ, 20টি জাতের ছাগল, 8টি জাতের উট, 6টি জাতের ঘোড়া, 18টি জাতের পোলট্রি পক্ষী পাওয়া যায়। তাই এই সমীক্ষা 50 বছর আগেকার, তই বিজ্ঞানীরা মনে করেন বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বাড়বে।

4.10.2 জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Biodiversity)

- বিশ্বের এক বৃহৎ উদ্ভিদ প্রজাতি সরাসরি মানুষ, গবাদি পশু ও খামারজাত প্রাণীর খাদ্য উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

● উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মানুষের বাড়িঘর নির্মাণ, কাগজ, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ ও মণ্ড সরবরাহ করে।

● পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ মানুষের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎস মাছ। এই মাছের প্রায় 80 শতাংশেরও বেশি আসে সমুদ্র থেকে।

● আদিম উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিন মানব প্রজাতির অস্তিত্ব এবং প্রগতির পথ এক অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ।

4.10.3 জীববৈচিত্র্যের সংকট (Crisis in Biodiversity)

1986 সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রতিদিন 50টির মত প্রজাতি পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে ও যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফলে সপুষ্পক উদ্ভিদের মোট 10% প্রজাতি আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি রূপে চিহ্নিত। হিসেব করে জানা গেছে 8000 বছর পূর্বে পৃথিবী পৃষ্ঠে 60 কোটি হেক্টর বনভূমি ছিল। এই পরিমাণ কমতে কমতে বর্তমানে (2001) 36 কোটি হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে যত ধরনের প্রজাতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই পাওয়া যায় বনভূমিতে। ভারতে গত 20–30 বছর ধরে অস্বাভাবিক হারে বনভূমি নষ্ট হয়েছে— গড়ে বছরে প্রায় 1 শতাংশ হারে। ফলে বহুসংখ্যক পাখি, সরীসৃপও উভচর প্রজাতি আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ভারতবর্ষে 340টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে 21টি প্রাণী বিলুপ্তির পথে। 1987 সালে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (BSI) রেড ডাটা বুক এর তথ্য অনুসারে অবলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা যথাক্রমে 33 ও 157। তা ছাড়া সংবেদনশীল (Vulnerable) উদ্ভিদের সংখ্যা 114।

জীববৈচিত্র্যের এই বিনাশ বা বিলুপ্তি নানাধরনের হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, জলভাগ ও স্থলভাগের আয়তনের পরিবর্তন, একটি প্রজাতির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়তনের পরিবর্তন ইত্যাদি প্রধান বিলুপ্তির কারণ। তবে ভূতাত্বিক সময়ের সাপেক্ষে প্রজাতি বিলুপ্তির হার তুলনামূলক ভাবে কম। বিজ্ঞানীদের মতে একটি প্রজাতির আয় 50 লক্ষ থেকে 1 কোটি বছর। সেই হিসাবে পৃথিবীর মোট প্রজাতির সংখ্যা 1.2 – 1.3 কোটি এবং ওই বছর বিলুপ্তির হার 1 – 3টি প্রজাতি।

বিগত 400 বছরে পৃথিবীব্যাপী মানুষের আধিপত্যের কারণে প্রজাতি বিলুপ্তি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই নিয়ে প্রায় 65টি স্তন্যপায়ী, 80টির বেশি পাখি সহ 200 টিরও বেশি মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং 360 টিরও বেশি অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। তালিকা দ্রষ্টব্য।

সারণি 4.6 ঃ বিপন্ন প্রজাতি ও বিলুপ্ত প্রজাতি

প্রজাতি	বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা	মোট প্রজাতির শতকরা হার	বিলুপ্ত প্রজাতির সংখ্যা
1. স্তন্যপায়ী	741	16	65
2. পাখি	1111	11	89
3. সরীসৃপ	316	4·5	20
4. উভচর	169	4	4
5. মাছ	679	4	33
6. অমেরুদণ্ডী	2754	0·2	364

উৎস ঃ IUCN Red List of threahened Animals, 1997

4.10.4 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Bio-diversity Conservation)

জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে পারলে বিবর্তনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করে এদের বিলুপ্তি প্রতিরোধ করা যায়। দুভাবে এই কাজ করা যায়— ইন-সিটু কনজারভেশন (in-situ conservation) এক্স-সিটু কনজারভেশন (ex-situ-conservation)

● **ইন-সিটু কনজারভেশন ঃ** প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রেখে স্বাভাবিক আবাসে যে রক্ষণ তাকে ইন-সিটু কনজারভেশন বলে। এই ধরনের সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনভূমি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

● **এক্স-সিটু কনজারভেশন ঃ** স্বাভাবিক আবাস থেকে দূরবর্তী ভিন্ন আবাসে প্রজাতির রক্ষণকে এক্স-সিটু কনজারভেশন বলে। এক্ষেত্রে জীবের প্রোটোপ্লাজম যুক্ত কোষ, ভ্রূণ, পরাগরেণু, শুক্রাণু কিংবা ডিম্বাণুকে চরম শৈত্য ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এই ধরনের সংরক্ষণের জন্য চিড়িয়াখানা, জিন ব্যাঙ্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

4.11. ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা (Concept of sustainable development)

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার প্রথম সফল উদ্যোগ শুরু হয় 1972 সালে। এই বছর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের মানব পরিবেশ (Human Environment) শীর্ষক সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের সব দেশকে আহ্বান করা হয়। এতে পরিবেশের মূল সমস্যাগুলি এবং দূষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা হয়, এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে 109টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর 1980 সালে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংঘ (International Union for the conservation of Nature and Natural Resources) ধারণযোগ্য বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটির উপর গুরুত্ব দেয়। এরও কয়েকবছর পর 1987 সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে স্থাপিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন (World commission on the Environment and development)। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রান্টল্যান্ড (Brundtland) এবং তার নাম অনুসারে এই কমিশন ব্রান্টল্যান্ড কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন ‘‘আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ’’ বা “Our Common Future” শীর্ষক প্রতিবেদনে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে— (i) পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং (ii) পরিবেশের গুনগত মান অপরিবর্তিত রেখে মানুষের জীবনধারণের মান উন্নয়নে যত্নশীল হওয়া। এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন স্থিতিশীল উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞা দেন— স্থিতিশীল উন্নয়ন হল বর্তমানের সমস্ত প্রয়োজনগুলিকে এমনভাবে মেটানো যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাগুলি মেটানোর ক্ষমতা নষ্ট না হয়। (Sustainable development is the development that meets the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.)। স্থিতিশীল উন্নয়নের সম্পর্কে ব্রান্টল্যান্ডের এই বক্তব্য পরবর্তীকালে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিলেও এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরে অবশ্য 1991 তে IUCN Report ‘কেয়ারিং ফর দি আর্থ’ (Carino for the Earth) এবং 1992-র সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বসুন্ধরা সম্মেলনের ‘এজেন্ডা 21’-ও (Agenda 21 of Earth Summit) উন্নয়ন সম্বন্ধে একই কথা বলে। অর্থাৎ স্থিতিশীল উন্নয়ন হল—

➠ (1) যা টিকিয়ে রাখা যায় কয়েক প্রজন্ম ধরে।

➠ (2) যার একটি সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

➠ (3) যা বর্তমানের জন্য হলেও ভবিষ্যতের কোনো ক্ষতি করে না।

➠ (4) যা বিশেষ করে পৃথিবীর গরিব মানুষের চাহিদা পূরণের দিকে বেশি নজর রাখে।

➠ (5) সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করে।

4.11.1 নীতি নির্দেশিকা (Guidelines)

স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পেয়েছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রধান নীতি নির্দেশিকাগুলি হল—

● [1] উন্নয়নমূলক যে-কোনো কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জনসাধারণকে অংশীদার করতে হবে।

● [2] বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক মতবাদ ও রীতিনীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং পরিবেশ ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন।

● [3] স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন—

➧ [a] সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

➧ [b] কোনো বিশেষ সম্পদ সেইসব কাজে ব্যবহার করতে হবে, যেসব কাজের পক্ষে ওই সম্পদটি বিশেষভাবে উপযোগী এবং আর কোনো সম্পদ পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। খনিজ তেল উত্তাপ সৃষ্টির কাজে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টি কয়লা, কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্বারাও হতে পারে। বিদ্যুৎ, কয়লা পুড়িয়ে অথবা জলপ্রবাহ থেকেও উৎপাদিত হতে পারে। খনিজ তেল পরিশোধন করে যে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন পাওয়া যায় তা মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর কাজ কয়লা, কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস বা জলবিদ্যুতের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং সংরক্ষণের জন্য খনিজ তেল উত্তাপ সৃষ্টি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার না করে মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর জন্য এবং আরও যেসব কাজ তেল ছাড়া আর অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা সম্ভব নয় সেইসব কাজের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

➧ [c] প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেলের মতো যেগুলি সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ সেগুলির পরিবর্তে যথাসম্ভব জলপ্রবাহ, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ ও বনভূমির মতো পুনর্ভব সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষণের জন্য শক্তি উৎপাদনের কাজে কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে জলস্রোতে, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ ও অন্যান্য অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

➧ [d] সম্পদের উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হবে। এমনভাবে উৎপাদন করতে হবে যাতে কোনো অপচয় না ঘটে এবং সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করা যায়।

➧ [e] কোনো জিনিসের উৎপাদন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে না। একটি বিশেষ অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয়ের দ্বারাই উৎপাদন সংঘটিত হয়। এই কারণে সম্পদ সংরক্ষণ করতে হলে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিবেচনা করলে চলবে না, শ্রম মূলধন প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলি নিয়েও বিবেচনা করতে হবে। ব্যাপক কৃষিপদ্ধতিতে বেশি জমিতে কম শ্রমিক ও কম মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ ফসল ফলানো হয়, প্রগাঢ় কৃষিপদ্ধতিতে কম জমিতে বেশি মূলধন ও বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে সেই একই পরিমাণ ফসল ফলানো যায়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাত কমিয়ে এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের অনুপাত বাড়িয়ে আমরা একই পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করতে পারি। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ হতে পারে।

➧ [f] গচ্ছিত সম্পদের মধ্যে কতগুলি সম্পদ প্রকৃতি থেকে আহরণের পর বারবার ব্যবহার করা (Recycling) যায়। যেমন আকরিক লোহা গচ্ছিত বা সঞ্চিত সম্পদ; একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং খনি থেকে উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ স্থায়ীভাবে কমে যাচ্ছে। কিন্তু, লোহা ও ইস্পাতের তৈরি জিনিস ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে সেগুলি গলিয়ে আবার নতুন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা যায়। লোহার মতো আরও বহু ধাতু

এমনিভাবে বারবার ব্যবহার করা যায়। এর জন্য অব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য সযত্নে সংগ্রহ করে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে।

➧ [g] ভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সম্পদ। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূমিকে আশ্রয় করেই মানুষ বেঁচে আছে। কৃষিকার্য, পশুপালন, অরণ্য ভূমির ওপরেই গড়ে ওঠে। ভূমির ওপরেই বাসগৃহ, কলকারখানা, শিক্ষায়তন, প্রমোদকেন্দ্র, ধর্মস্থান, শহর, নগর, রেলপথ, সড়ক, বিমানবন্দর, নৌবন্দর প্রভৃতি নির্মিত হয়। এখনও মানবসভ্যতার অগ্রগতি বহুলাংশে ভূমির ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণেই ভূমির সংরক্ষণ এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার বিশেষভাবে জরুরি।

➧ [h] সবরকম সম্পদ সংরক্ষণের জন্য একই নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে না। সম্পদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি স্থির করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটছে। সঙ্গে সঙ্গে এদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। খনিজ নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরি করা হয়। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে সার উৎপাদনের কাজে লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে খনিজ নাইট্রেটের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই সম্পদ সংরক্ষণের তাগিদও কমে গেছে। সহজে, সস্তায় ও নিরাপদে আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে অথবা সৌরশক্তি থেকে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে কয়লা ও খনিজ তেল সংরক্ষণের জন্য এখনকার মতো এত উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তা থাকবে কি?

➧ [i] পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক অপচয় ঘটে যুদ্ধের ফলে। আধুনিক সর্বাত্মক মহাযুদ্ধ অপরিমেয় সম্পদের ধ্বংসসাধন করে। এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পদের ধ্বংসসাধন করছে। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সম্পদ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই পুরোপুরি ফলপ্রসূ হবে না।

➧ [j] সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টি স্বার্থের মধ্যে যে মূল দ্বন্দ্ব রয়েছে তা দূর করতে হবে। এর জন্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে জনগণের চেতনা বৃদ্ধি এবং যেসব সম্পদের সংরক্ষণ জরুরি সেগুলির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো না কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। জাগ্রত জনমানস ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই সমষ্টিস্বার্থের সর্বপ্রধান রক্ষক।

● [4] **বসুন্ধরার বহনক্ষমতা অনুযায়ী উন্নয়ন ঃ** পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের [Ecosystem] বহনক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে পরিবেশ দূষিত হয় ও বাস্তুতন্ত্র বিপর্যয় হয়ে পড়ে। সব অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা সমান নয়। কোনো অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা অনুযায়ী সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা ও জীবনযাপন প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। তবেই উন্নয়ন স্থিতিশীল হবে। এর জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তি ও কর্মপন্থা প্রয়োগ করা দরকার।

● [5] **পরিবেশের গুণগত মান বজায় রেখে উন্নয়ন ঃ** উন্নয়নের যেসব পন্থা ও পদ্ধতি পরিবেশের গুণগত মানের হ্রাস ঘটায়, বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে সেগুলি বাদ দিতে হবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা দরকার। কারণ পরিবেশের গুণগত মান বজায় থাকলেই বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

● [6] **অসাম্য দূরীকরণ ঃ** পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি দেশ ধনী। বেশির ভাগ দেশ দরিদ্র। একটি দেশের মধ্যেও অঞ্চলে-অঞ্চলে বৈষম্য রয়েছে। পাঞ্জাবের তুলনায় বিহার বা ওড়িশা অনেক পিছিয়ে আছে। একটি অঞ্চলের মধ্যেও ধনী দরিদ্রে বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। এই সর্বব্যাপী অসাম্য নানাভাবে সম্পদের অপচয়, বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় এবং

পরিবেশের নিদারুণ ক্ষতি করছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য দেশে-দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে, মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

● [7] **দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** পরিবেশ দূষিত হলে সম্পদের ধ্বংসসাধন ঘটে, বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত শুধু যে উন্নয়ন ব্যাহত হয় তাই নয়, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়।

● [8] **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ** বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা 600 কোটিরও বেশি। আগামী 50 বছরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে 650 কোটি। লোকসংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের ওপর নিদারুণ চাপ পড়বে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পদের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে উন্নয়ন সুস্থায়ী করতে হলে, জন্মহার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

4.12. অনুশীলনী

1. গ্রিন হাউস প্রভাব বলতে কি বোঝায়?
2. গ্রিন হাউস গ্যাস কোনগুলি ? এর প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা কিরূপে বৃদ্ধি পায় ব্যাখ্যা কর।
3. CFC গ্যাসের প্রভাব কি?
4. বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের ক্ষয় ও ওজোন হোলের সৃষ্টি কিভাবে হয় আলোচনা কর।
5. অম্লবৃষ্টি জলাশয়ের উপর কি প্রভাব ফেলে ?
6. ভারতে অম্লবৃষ্টি কোন কোন জায়গায় দেখা যায়?
7. বিশ্ব উষ্ণকরণ বলতে কি বোঝায়?
8. অ্যান্টার্কটিকায় ওজোনছিদ্র বলতে কি বোঝায়?
9. ওজোন বিনাশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি ভাবে নেওয়া যায়?
10. El Nino কি?
11. বৃক্ষছেদন বলতে কি বোঝো?
12. দুটি পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।
13. জীববৈচিত্র্যের সংকট বলতে কি বোঝায়?
14. ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা বলতে কি বোঝায়?

একক 5 ❑ পরিবেশ আইন

গঠন

5.1 পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও আইনের প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহ
5.2 ভারতে পরিবেশ বিষয়ক আইনের ক্রমবিবর্তন
5.3 স্বাধীনতা পরবর্তী পরিবেশ বিষয়ক আইন
5.4 রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যক্রম
5.5 কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যক্রম
5.6 ভারতে পরিবেশ বিষয়ক আইনের ক্রমবিবর্তন

5.1. পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও আইনের প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহ

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই তাদের নিজস্ব কিছু না কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত আইন আছে। আইনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের জৈব ও অজৈব সম্পদকে বাঁচানো। এর ফলে জল, বায়ু ও ভূমিজ সম্পদ দূষণমুক্ত থাকে।

ভারতের প্রধান প্রাকৃতির সম্পদ বলতে বোঝায়, অরণ্য, মালভূমি, সমুদ্র উপকূলবর্তী অরণ্যভূমি ও প্রাণীজ সম্পদ, জল ও জলভূমি। এই সমস্ত সম্পদকে বাঁচানোর জন্য তিনস্তরের আইনের প্রয়োজন আছে।

যেমন—

(ক) বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা

(খ) প্রাণীজগতকে রক্ষা করা

(গ) সমস্ত রকম প্রাণীজ প্রজাতিকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা

এই সমস্ত সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জীনগত সম্পদকে অবিকৃত রেখে রক্ষা করা যেতে পারে বিভিন্ন রকম সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে যেমন ন্যাশনাল পার্ক, স্যানচুয়ারি, ভূমি ও অরণ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি। এগুলি একেবারে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে করা হয়।

আর একটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে যেমন কৃত্রিম পদ্ধতি। যেমন চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কৃত্রিম জলাশয় ইত্যাদি।

5.2. ভারতের পরিবেশ বিষয়ক আইনের ক্রমবিবর্তন

ভারতে পরিবেশ বিষয়ক আইনের প্রথম প্রবর্তন হয় জলদূষণ রক্ষার জন্য। মূলত কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাই তিনটি প্রেসিডেনসি মেয়র কোর্টে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। কলকাতার জন্য এই আইন প্রণয়ন হয় ১৬৬১ সালে, চেন্নাই এর জন্য ১৬৮৭ সালে এবং মুম্বাই এর জন্য আইন প্রণীত হয় ১৭১৮ সালে। পরবর্তী কালে এই আইনগুলি বিভিন্ন উচ্চ আদালত দ্বারা গৃহীত হয়। কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাই আদালতে পৃথক পরিবেশ আদালত তৈরি হয় যুক্তরাষ্ট্রের অণুকরণে। এই আইনগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) যে কোনও প্রকার প্রাণীজগতের পক্ষে ক্ষতিকারক বস্তুকে দূরে রাখা বাধ্যতামূলক।

(খ) কোনও প্রকার ক্ষতিকারক বস্তু থেকে জল, বায়ু ও ভূমি রক্ষা করা।

(গ) জল সম্পদের উপর শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন ও রক্ষা করা।

5.3. স্বাধীনতা পরবর্তী পরিবেশ বিষয়ক আইন

উপরিউক্ত আইনগুলি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও ব্রিটিশ আইনের অণুকরনে করা হয়েছিল। কিন্তু নিম্নোক্ত আইনগুলি কিছুটা আগের আইনের অণুকরণে করা হয়েছিল। কিন্তু নিম্নোক্ত আইনগুলি কিছুটা আগের আইনের অণুকরণে হলেও মূলত স্বাধীনতা বিভিন্ন ধরণের সম্পদ রক্ষার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১) ১৯৪৮ এর - কারখানা সংক্রান্ত আইন

(২) ১৯৫২ এর - খনি বিষয়ক আইন

(৩) ১৯৬২ এর - পারমাণবিক আইন

(৪) ১৯৬৮ এর - কীটনাশক সংক্রান্ত আইন

(৫) ১৯৭২ এর - বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন

(৬) ১৯৭৪ এর - জল দূষণ সংক্রান্ত আইন

(৭) ১৯৭৭ এর - জল দূষণ সংক্রান্ত আইন

(৮) ১৯৮০ এর - অরণ্য সম্পদ সংক্রান্ত আইন

(৯) ১৯৮১ এর - বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন

(১০) ১৯৮৬ এর - পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন

(১১) ১৯৯১ এর - গণবিমা সংক্রান্ত আইন

(১২) ১৯৯৫ এর - জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত ট্রাইবুনাল

(১৩) ১৯৯৭ এর - জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত অ্যাপিল বিভাগ

এই আইনগুলির মধ্যে ১৯৭৪-এর জলদূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১-এর বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন বিশেষ আলোচনার দাবি করে।

১৯৭৪-এর জল দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ঃ

১৯৭৪-এ সংসদে প্রথম উপরিউক্ত আইনটি প্রণয়িত হয়। মূলত জলসম্পদ রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণএর জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল।

এই আইনের সাহায্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে রাজ্য স্তরেও জলদূষণ সংক্রান্ত কমিটি তৈরি করা হয়।

এই কমিটিগুলি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল, কেন্দ্রীয় স্তরে জল দূষণ পর্যবেক্ষণ করা। প্রয়োজনে এই কমিটিগুলি উপযুক্ত উপদেশ ও সাহায্য দিয়ে থাকে। এই আইনের মূল ধারা ঃ

জল আইন ধারা 64 (A), তৈরি হয়, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সপক্ষে। পরবর্তী ধারাটি তৈরি হয় ১৯৭৫-এ।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ১৯৮১ ঃ

জলদূষণ সংক্রান্ত আইনের মত এই বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আইন সংসদে অনুমোদন পায় ২৫২(১) ধারায়। ১২টি রাজ্যের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৮১ সালে এটি আইনে রূপায়িত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ধারা ২৫৩-র এই আইন আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

১৯৮১-এর বায়ু দূষণ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে প্রথমত বায়ু দূষণকারী অঞ্চলের দূষণকারী সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যেন সূচনাতেই পর্যদের ছাড়পত্র নিয়ে নেয় এবং এগুলি দেখার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮১-এর বায়ু দূষণ আইন অনুসারে ধারা ৫৪-য় (১৯৮১)-র আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ১৯৮৩, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫-তে আইনের রদবদল করা হয়।

5.4. রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যক্রম

(১) ১৯৭৪-এর জলসম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ আইন

(২) ১৯৭৭-এর জলসম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ আইন

(৩) ১৯৮১-এর বায়ু দূষণ আইন

(৪) ১৯৮৬-এর পরিবেশ রক্ষা আইন

(৫) ১৯৮৯-এর ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ আইন

(৬) ১৯৮৯-এর ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতিকরণ, সংরক্ষণ এবং আমদানি আইন

(৭) ১৯৯২-এর গণ জীবনবিমা সংক্রান্ত আইন

(৮) এই সমস্ত আইনের প্রয়োগ, রক্ষা ইত্যাদি

5.5. কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যক্রম

(১) ১৯৭৪-এর জল সম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন ও এই বিষয়ে রাজ্যগুলির পর্যবেক্ষণ। প্রয়োজনে রাজ্যগুলিকে উপদেশ ও সাহায্য দেওয়া এবং সময়মত দূষণ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রচার করা।

(২) ১৯৮১ বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন যেগুলি ১৯৭৪-এর ৬ ধারার অন্তর্গত। রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনমত উপদেশ ও সাহায্য ছাড়াও উপযুক্ত পরিসংখ্যান প্রচার করা ও জনমত গঠন করা।

সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষে বর্তমানে নিম্নোক্ত আইনগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ পর্যদের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৯৮৬ — পরিবেশ সংরক্ষণ অধিনিয়মে (ইপিএ) বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবিকই একটি সার্বিক পদক্ষেপ। এই আইনটি ১৯৮৪ সালের মর্মান্তিক ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্টকহলমে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে বিধিবন্ধ হয়। এটি ভারতে সরকারকে বায়ু, জল ও শব্দদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব প্রদান করে। এই আইন প্রণয়নের প্রভাবে পূর্বতন আইনের অধীনস্থ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আজকের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের গঠিত হয়। উপরোক্ত আইন লঙ্ঘনকারী কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে জল বিদ্যুৎ সরবরাহ

বন্ধ করার আদেশ বলবৎ করার অধিকার এই কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা আছে।

১৯৮৬ — পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীনে পরিবেশ দূষক নির্গমন নিক্ষেপ মান, মোটর যান থেকে নির্গত শব্দ, ধোঁয়া এবং দূষীত বাস্প নিঃসরণের গুণমান, বিবিধ মোটর যানের দূষণ মাপার পদ্ধতি, দূষক নিঃসরণের মাত্রা, সর্বজনীন পয়ঃপ্রণালী থেকে নির্গত বর্জ্য জল, ভূমিতে জল সেচন এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবেশ (দূষণ) নিয়মাবলী গঠিত হয়। বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক বার্ষিক দূষণ বিবরণ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে দাখিল করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এটি এই আইনের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রকল্পের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ণ জমা করা এই আইনের বিধানে আছে। (Environmental Impact Assement বা EIA)

১৯৮৯ — বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপণ ও পরিচালন
নিয়মাবলী ঃ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, সংগ্রহ, শোধন (প্রক্রিয়ার অধুনাকরণ), আমদানি, গুদামজাত করা (মজুত) এবং বিপজ্জনক বর্জ্য মোকাবিলা করা পরিবেশ আইন অধীনে গঠিত।

১৯৮৯ — বিপজ্জনক রাসায়নিক উৎপাদন, মজুত ও আমদানি সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ এই প্রসঙ্গে আমদানীর শিল্প সংস্থার কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিপজ্জনক রাসায়নিক ও অন্যান্য বস্তু মজুদ ও সুবিধাগুলি একদল বিশেষজ্ঞ দ্বারা বাৎসরিক নিরীক্ষণ করার ব্যবস্থা এই আইনের আওতায় আছে।

১৯৮৯ — বিপজ্জনক আণুবীক্ষণিক প্রাণী / জীব প্রযুক্তিজাত প্রাণী অথবা কোষ ইত্যাদির উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি, রপ্তানি ও মজুত সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ জিন প্রযুক্তি ও আণুবিক্ষণিক প্রাণী প্রয়োগ প্রসঙ্গে পরিবেশ, প্রকৃতি এবং স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এই নিয়মাবলী উপস্থাপিত হয়।

১৯৯১ — লোকদায় বিমা আইন ঋ নিয়মাবলী ঋ সংশোধনী, ১৯৯২ ঃ বিপজ্জনক কোন বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, দূর্ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদানের হেতু লোকদায় বীমার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে।

১৯৯৫ — জাতীয় পরিবেশ ট্রাইবুনাল আইনউক্ত বিপজ্জনক বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় কোন ব্যক্তি আহত বা পরিবেশগত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে।

১৯৯৭ — জাতীয় পরিবেশ প্রাধিকরণ কর্তৃত্ব আইন অনুযায়ী পরিবেশ রক্ষণের বিধির অধীনে শিল্পসংক্রান্ত ক্ষেত্র বিশেষে অনুমোদিত কিছু নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আপীল শুনানীর জন্য প্রণীত হয়।

বন ও বন্যপ্রাণী

১৯২৭ — ভারতীয় বনভূমি আইন ও ১৯৮৪-র সংশোধনী

১৯৭২ — বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৩ এবং সংশোধনী ১৯৯১ ঃ পশু-পক্ষীদের প্রকৃতিতে বসবাসযোগ্য স্থান এবং সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন প্রণীত হয়েছে।

১৯৮০ — বনভূমি (সংরক্ষণ) আইন ও নিয়মাবলী ১৯৮১ ঃ বন সংরক্ষণের জন্য গঠিত।

জল দূষণ সম্বন্ধীয়

১৮৮২ — হকশফা আইন

১৮৯৭ — ভারতীয় মৎস্যচাষ উদ্যোগ আইন

১৯৫৬ — নদী পর্ষদের আইন
১৯৭০ — পোত পরিবহন ব্যবসায়ী আইন
১৯৭৪ — জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন)
১৯৭৭ — জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন
১৯৭৮ — জল (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর নিয়মাবলী
১৯৯১ — উপকূলবর্তী অঞ্চল সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তি

বায়ুদূষণ
১৯৪৮ — শিল্পশালা (কারখানা) আইন এবং ১৯৮৭ সালের সংশোধনী আইন
১৯৮১ — বায়ু (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন
১৯৮২ — বায়ু (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) নিয়মাবলী
১৯৮২ — পারমাণবিক শক্তি আইন
১৯৮৭ — বায়ু (দূষণ নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন
১৯৮৮ — যানবাহন সংক্রান্ত আইন

পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও আইনের প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহ

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই তাদের নিজস্ব কিছু না কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত আইন আছে। আইনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের জৈব ও অজৈব সম্পদকে বাঁচানো। এর ফলে জল, বায়ু ও ভূমিজ সম্পদ দূষণমুক্ত থাকে।

জল ও জলাভূমি ঃ ভারতের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে বোঝায়, অরণ্য, মালভূমি, সমুদ্র উপকূলবর্তী অরণ্যভূমি ও প্রাণীজ সম্পদ, এই সমস্ত সম্পদকে বাঁচানোর জন্য তিনস্তরের আইনের প্রয়োজন আছে।

যেমন—

(ক) বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা
(খ) প্রাণীজগতকে রক্ষা করা
(গ) সমস্ত রকম প্রাণীজ প্রজাতিকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা

এই সমস্ত সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জীনগত সম্পদকে অবিকৃত রেখে রক্ষা করা যেতে পারে বিভিন্ন রকম সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে যেমন ন্যাশনাল পার্ক, স্যানচুয়ারি ভূমি ও অরণ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি। এগুলি একেবারে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে করা হয়।

আর একটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে যেমন কৃত্রিম পদ্ধতি। যেমন চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কৃত্রিম জলাশয় ইত্যাদি।

5.6. ভারতের পরিবেশ বিষয়ক আইনের ক্রমবিবর্তন

ভারতে পরিবেশ বিষয়ক আইনের প্রথম প্রবর্তন হয় জলদূষণ রক্ষার জন্য। মূলত কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাই তিনটি প্রেসিডেনসি মেয়র কোর্টে এই আইন প্রণয়ন করা হয়। কলকাতার জন্য এই আইন প্রণয়ন হয় ১৬৬১ সালে, চেন্নাই এর জন্য ১৬৮৭ সালে এবং মুম্বাই এর জন্য আইন প্রণীত হয় ১৭১৮ সালে। পরবর্তী কালে এই

আইনগুলি বিভিন্ন উচ্চ আদালত দ্বারা গৃহীত হয়। কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাই আদালতে পৃথক পরিবেশ আদালত তৈরি হয় যুক্তরাষ্ট্রের অণুকরণে। এই আইনগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) যে কোনও প্রকার দূষণ যাহা প্রাণীজগতের পক্ষে ক্ষতিকারক সেই সমস্ত বস্তুকে দূরে রাখা বাধ্যতামূলক।

(খ) যেকোনও প্রকার ক্ষতিকারক বস্তু থেকে জল, বায়ু ও ভূমি সম্পদকে রক্ষা করা।

(গ) জল সম্পদের উপর শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন ও এই অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করা।

উপরিউক্ত আইনগুলি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও ব্রিটিশ আইনের অণুকরনে করা হয়েছিল। কিন্তু নিম্নোক্ত আইনগুলি কিছুটা আগের আইনের অণুকরণে হলেও মূলত স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন ধরণের সম্পদ রক্ষার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১) ১৯৪৮ এর - কারখানা সংক্রান্ত আইন

(২) ১৯৫২ এর - খনি বিষয়ক আইন

(৩) ১৯৬২ এর - পারমাণবিক আইন

(৪) ১৯৬৮ এর - কীটনাশক সংক্রান্ত আইন

(৫) ১৯৭২ এর - বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন

(৬) ১৯৭৪ এর - জল দূষণ সংক্রান্ত আইন

(৭) ১৯৭৭ এর - জল দূষণ সংক্রান্ত আইন

(৮) ১৯৮০ এর - অরণ্য সম্পদ সংক্রান্ত আইন

(৯) ১৯৮১ এর - বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন

(১০) ১৯৮৬ এর - পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন

(১১) ১৯৯১ এর - গণবিমা সংক্রান্ত আইন

(১২) ১৯৯৫ এর - জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত ট্রাইবুনাল

(১৩) ১৯৯৭ এর - জাতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত অ্যাপিল বিভাগ

এই আইনগুলির মধ্যে ১৯৭৪-এর জলদূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১-এর বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন বিশেষ আলোচনার দাবি করে।

১৯৭৪-এর জল দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন

১৯৭৪-এ সংসদে প্রথম উপরিউক্ত আইনটি প্রণয়িত হয়। মূলত জলসম্পদ রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল।

এই আইনের সাহায্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে রাজ্য স্তরেও জলদূষণ সংক্রান্ত কমিটি তৈরি করা হয়।

এই কমিটিগুলি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল, কেন্দ্রীয় স্তরে জল দূষণ পর্যবেক্ষণ করা। প্রয়োজনে এই কমিটিগুলি উপযুক্ত উপদেশ ও সাহায্য দিয়ে থাকে। এই আইনের মূল ধারা ঃ

জল আইন ধারা 64 (A), তৈরি হয়, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সপক্ষে। পরবর্তী ধারাটি তৈরি হয় ১৯৭৫-এ।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ১৯৮১

জলদূষণ সংক্রান্ত আইনের মত এই বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আইন সংসদে অনুমোদন পায় ২৫২(১) ধারায়। ১২টি রাজ্যের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৮১ সালে এটি আইনে রূপায়িত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ধারা ২৫৩-র এই আইন আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

এই আইনের মুখ্য ভূমিকা অনুসারে এই আইনটি UNO আয়োজিত ১৯৭২-এর স্টকহলম সম্মেলনে আলোচিত ও গৃহীত হয়।

১৯৮১-এর বায়ু দূষণ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে প্রথমত বায়ু দূষণকারী অঞ্চলের দূষণকারী সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যেন সূচনাতেই পর্ষদের ছাড়পত্র নিয়ে নেয় এবং এগুলি দেখার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮১-এর বায়ু দূষণ আইন অনুসারে ধারা ৫৪-য় (১৯৮১)-র আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ১৯৮৩, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫-তে আইনের রদবদল করা হয়।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যক্রম

(১) ১৯৭৪-এর জলসম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ আইন

(২) ১৯৭৭-এর জলসম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ আইন

(৩) ১৯৮১-এর বায়ু দূষণ আইন

(৪) ১৯৮৬-এর পরিবেশ রক্ষা আইন

(৫) ১৯৮৯-এর ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ আইন

(৬) ১৯৮৯-এর ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতিকরণ, সংরক্ষণ এবং আমদানি আইন

(৭) ১৯৯২-এর গণ জীবনবিমা সংক্রান্ত আইন (লোকদায় বীমা)

(৮) এই সমস্ত আইনের প্রয়োগ, রক্ষা ইত্যাদি

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কার্যক্রম

(১) ১৯৭৪-এর জল সম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন ও এই বিষয়ে রাজ্যগুলির পর্যবেক্ষণ। প্রয়োজনে রাজ্যগুলিকে উপদেশ ও সাহায্য দেওয়া এবং সময়মত দূষণ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রচার করা।

(২) ১৯৮১ বায়ু দূষণ সংক্রান্ত আইন যেগুলি ১৯৭৪-এর ৬ ধারার অন্তর্গত। রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনমত উপদেশ ও সাহায্য ছাড়াও উপযুক্ত পরিসংখ্যান প্রচার করা ও জনমত গঠন করা।

একক 6 ❑ জনসংখ্যা ও পরিবেশ

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা

6.2 উদ্দেশ্য

6.3 পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন ঃ অতীত, মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগ

6.4 ভারতের জনসংখ্যা ঃ গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

6.5 জনসংখ্যার পরিবর্তন ঃ তত্ত্ব ও পর্যায়

6.6 স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

6.7 অনুশীলনী

6.8 সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

6.1. প্রস্তাবনা

অতীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল, তারা কোথায় বাস করতো, কী করতো, জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার কী রকম ছিল, কী কী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটল এসব সম্বন্ধে কৌতুহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে কৌতুহল মেটানো হয়েছে।

6.2. উদ্দেশ্য

বর্তমানে পরিচ্ছেদটি পাঠ করে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন ঃ অতীত থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত।
- ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৯০১ - ২০০১ সাল পর্যন্ত।
- জনসংখ্যার বিবর্তন বিভিন্ন পর্যায় ও পর্যায় গঠনের কারণ।
- জীবনগত পরিসংখ্যান ও পরিমাণ, জন্মহার ও মৃত্যুহার।
- জন্মহারের পার্থক্যের কারণসমূহ।
- মৃত্যুহারের আঞ্চলিক ও জাতিগত পার্থক্য।
- উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য।
- মৃত্যুহারের বণ্টন।
- ভারতে মৃত্যুহার।
- জনঘনত্ব পরিমাপ।
- জীবনবণ্টনের তারতম্যের কারণ।
- পৃথিবী জনসংখ্যা বণ্টন।
- ভারতের জনঘনত্ব।

6.3. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ভূমিকা (Introduction)

অতীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল, তারা কোথায় বাস করতো, তারা কী করতো, তাদের আচার-আচরণ কী রকম ছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কী রকম ছিল, কী কী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল, গ্রাম কিভাবে শহর পরিণত হলো, এসব সম্বন্ধে কৌতুহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কথায় আছে— 'Present is the key to the past.' অনাদি অতীতের বন্ধ দরজা খুললে পৃথিবীর প্রাচীন জনসংখ্যা-বিষয়ক বহু তথ্য জানতে পারবো, যা অনেক সময় আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণেও সাহায্য করবে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে মানুষের বাড়-বৃদ্ধি কিভাবে ঘটল, কী কী ধাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছল তা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ (Pre-historic Age)

খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার পর্যায় (Food Gathering and Hunting Stage)

খুব কম হলেও প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে প্রস্তরযুগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের (যাদের বৈজ্ঞানিক নাম— *হোমো-স্যাপিয়েন্স বা ক্রো-ম্যাগনন*) আর্বিভাব ঘটেছিল। শুধুমাত্র সময়ই নয়, পৃথিবীতে কোথায় তার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাও নিশ্চিন্ত করে বলা যায় না। আদিম মানুষের অস্থি বা তার যন্ত্রপাতির খোঁজ মিলেছে ইউরোপে, এশিয়ায় ও আফ্রিকায়। বেশির ভাগ নৃতাত্ত্বিকের ধারণা আদিম মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, তাও নিশ্চিন্ত করে বলা যায় না। আদিম মানুষের অস্থি বা তার যন্ত্রপাতির খোঁজ মিলেছে ইউরোপ, এশিয়ায় ও আফ্রিকায়, বেশির ভাগ নৃতাত্ত্বিকের ধারণা আদিম মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন জায়গায়। আফ্রিকা এই বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, এশিয়া ছিল গৌণ বিন্দুতে। ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন বা হোমো স্যাপিয়েন্সদের অস্তিত্বের খোঁজ মিলেছে 35,000 বছর আগে; আর আমেরিকাতে আরও পরে, প্রায় 25,000 বছর আগে।

অনুমান করা হয় যে প্রাচীন পৃথিবীর (old World) কেন্দ্রবিন্দু থেকে সামান্য সংখ্যায় হলেও প্রস্তরযুগের মানুষ শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ পেশাকে ভিত্তি করে পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষিবিপ্লবের আগে— অর্থাৎ প্রায় 10,000 বছর আগে— যখন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে বরফ গলতে শুরু করেছিল, তখন মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে, দুই আমেরিকার অনেকখানি, ইউরোপের 50^0 উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত বহু স্থান জুড়ে বাস করতো।

প্রায় 25,000 বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় 3.3 মিলিয়ন। 15,000 বছর পরে (অর্থাৎ প্রায় 10,000 বছর আগে) এটা বেড়ে সম্ভবত 5.3 মিলিয়নে পৌঁছেছিল। অনুমান করা হয় যে এই সময়ে পৃথিবীতে গড় জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে 0.44 জন। খাদ্য সংগ্রহ পর্যায়ে যদিও পৃথিবীতে গড় জনঘনত্ব কম ছিল, তবুও সবসময় ও সবজায়গায় একই রকম জনঘনত্ব ছিল না। Dewey-র মতে বরফযুগের (Ice Age) সূচনায় যখন মানুষ খাদ্যের জন্য ছিল প্রকৃতিনির্ভর, তখন প্রতি 100 বর্গকিমিতে জনঘনত্ব ছিল 3 জন। অনুমান করা হয় খাদ্য সংগ্রহের আর একটু উন্নত পর্যায় - অর্থাৎ কিনা বরফযুগের শেষে ও বরফোত্তর (post-glacial)

যুগের শুরুতে — এই গড় জনঘনত্ব গিয়ে দাঁড়াল 12.5 জন। যেমন ক্যারিবো (বল্গা হরিণ) শিকারী এস্কিমোদের দেশে জনঘনত্ব প্রতি 100 বর্গকিমিতে ছিল 1.07 জন, বুনো ধান সংগ্রহক ওজিবাদের (Ogibwa) 13 জন, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 8 জন।

যতদুর জানা গেছে প্রস্তরযুগে (Stone age) মানুষদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছিল কম, সম্ভবত 6 থেকে 12 জন সদস্য নিয়ে এক একটি পরিবার। অবশ্য যেখানে বেশি রকম খাদ্য পাওয়া যেত সেই সব জায়গায় কিছু ব্যতিক্রম ছিল। খাবার সংগ্রহে ভাটা পড়লে তবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার প্রশ্ন উঠত। পৃথিবীতে মানুষের আর্বিভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর কোথায় কত জন লোক বাস করতেন, জনঘনত্ব বা কত ছিল তা Deevey-র 'Scientific American' পত্রিকায় (Vol. 203, 1960) প্রকাশিত ''Human Population'' নামক প্রবন্ধটি থেকে তুলে দেওয়া হল (সারণি)।

সারণি 6.1 ঃ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

বছর আগে (আনুমানিক)	সাংস্কৃতিক অবস্থান	বাসস্থান	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসেবে)	অনুমিত জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে)
1,000,000	নিম্ন প্রস্তর যুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	আফ্রিকা	0.12	0.004
300.000	আদি প্রস্তর যুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	আফ্রিকা ইউরেশিয়া	1	0.012
25,000	মধ্য প্রস্তর যুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	,, মহাদেশ	3.34	0.04
6,000	গ্রামীণ কৃষিও নতুন নগরায়ণ	পুরানো পৃথিবী নতুন পৃথিবী	86.5	1.0 0.04
2,000	গ্রামীণ কৃষিও নগরায়ণ	সমস্ত মহাদেশ	133	1.0
310(1650)	কৃষি ও শিল্প	ঐ	545	3.7
210(1750)	ঐ	ঐ	728	4.9
160 (1800)	ঐ	ঐ	906	6.2
60(1900)	ঐ	ঐ	1,610	11.0
10(1950)	ঐ	ঐ	2,500	16.4
2000 (খ্রীঃ অঃ)	ঐ	ঐ	6,270	46.0

কৃষি বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর জনসংখ্যার বড় রকমের বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছিল (চিত্র 6.1)। তবে এটা ঠিক যে খাদ্যসংগ্রহ থেকে কৃষিকাজে অংশ নিতে কয়েক হাজার বছর কেটে যায়। চাষবাসের শুরু সময় থেকে কিছু কিছু এলাকায় ও পরবর্তীকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্যচাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল, এর ফল ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা আস্তে আস্তে সরে গেল। বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। ব্যবধান স্থান করে দিল সম্পর্কের। ফলে পরিবর্তন ঘটল তাড়াতাড়ি।

প্রাচুর্য আর খাদ্য যোগানের নিরাপত্তা প্রতি বর্গ পরিমাপ জায়গায় আরো বেশি-সংখ্যক লোকের বসবাসের সুযোগ করে দিল। আর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে কিছু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হল, ফলত কিছু লোক নতুন নতুন

কাজের জন্য পাওয়া গেল। তাই কৃষি আবিষ্কারের পর তাঁত, লাঙল, চাকা, ধাতব জিনিষের প্রয়োজন ঘটল। Zelinsky-র ভাষায় "This was the first decisive step toward control of the environment (P-84)."

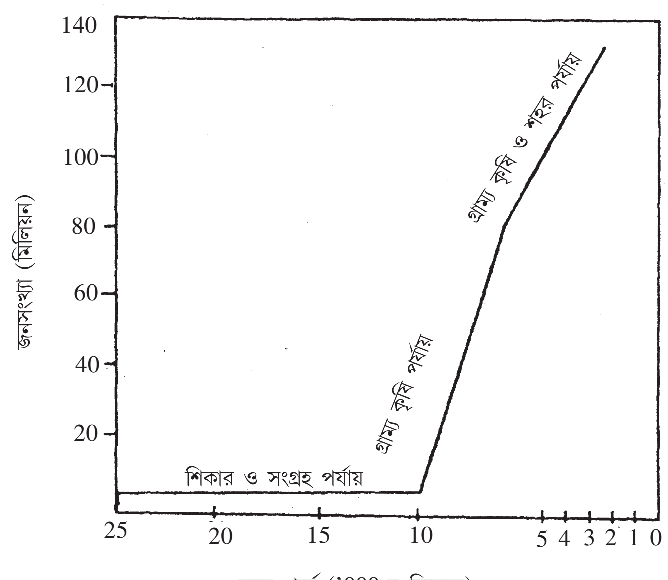

Selinsky— আরো লিখেছেন যে, "Socio-economic development was hardly more advanced than it had been in the favoured localities among specialised collectors, hunters and fishermen."

কৃষিভিত্তিক জীবন স্থায়ী গ্রামীণ বসতির জন্ম দিয়েছিল। প্রায় 8000-9000 বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জেরিকোতে (Jericho) যে কৃষিবিপ্লব দেখা দেয়, (চিত্র 6.2), তার ফল ছিল ব্যাপক। প্রথমতঃ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে আয়ত্ত এনে খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পেরেছিল, ফলে মানুষ যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি পাবার স্বাদ পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, খাদ্য-সংগ্রহের অহেতুক ঝুঁকি, নেবার প্রয়োজনীয়তা কমে গেল। ফলে অপঘাতজনিত মৃত্যু কমে গিয়ে জনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তৃতীয়ত, যাযাবর জীবনে প্রতিটি মানুষকেই খাদ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হত, কিন্তু কৃষিকাজে প্রতিটি মানুষের শ্রমের প্রয়োজন ছিল না। ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল কিছু লোক নতুন নতুন সৃষ্টির কাজে হতে দিল। চতুর্থত, স্থায়ী বসতিতে সমাজ জীবনের বিকাশ ঘটল। কারণ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা, বৃত্তি (occupation) বণ্টন ও সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে একটা সমাজ জীবনের রূপ দিল। Zelinsky-র ভাষায় "Assured of relative abundance, these hunters, fishermen and collectors were able to build larger, more complex societies." (P.83)

পঞ্চমত, এই সময় থেকে মানুষ পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল। এর ফল ছিল ব্যাপক। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে এই সময়ে আমেরিকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিশেষত মেক্সিকোর তেহুকান (Tehukan) উপত্যকায় কিছু কিছু চাষবাস শুরু হয়েছিল। Braidwood, Krozman ও Tax সেই সময়কার পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(1) ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ উত্তর অঞ্চল, ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ ও দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চল যা এর আগে ছিল জনবসতিহীন।

(2) সিন্ধু উপত্যকা, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া - এখানে চাষবাসের পাশাপাশি খাদ্যসংগ্রহ চালু ছিল। স্বভাবতই এই সব এলাকা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ।

(3) দু'য়ের মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ অঞ্চল - এখানে মানুষ পুরনো খাদ্যসংগ্রহ প্রথার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করত, আর জনঘনত্ব ছিল মাঝারি রকমের।

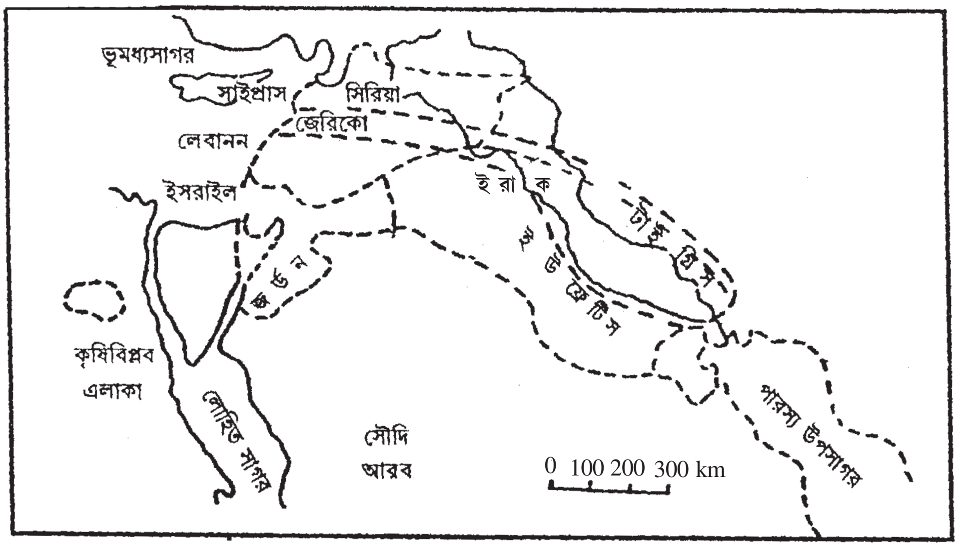

চিত্র 6.2 ঃ পৃথিবীতে কৃষিবিপ্লবের প্রথম এলাকা (Trewartha-র অনুকরণে)

এবার নগরায়ণের কথায় ফিরে আসা যাক। জেরিকোতে প্রথম নগরায়ণ থেকে শুরু করে পরবর্তী 3000 - 4000 বছরের মধ্যে নগরায়ণ আরও প্রসার লাভ করে। আনুমানিক 4,000 বছরের আগে ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস নদী উপত্যকায় ইরেখ, এরিডু, ঊর, লাগাস, লারমা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছিল (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)। আরও উত্তরে ছিল কিশ ও জেমদেত নামে দুটো শহর। ঐ একই সময়ে মিশরের নীল নদের নিম্ন উপত্যকায় থিস, মেমফিস, হেলিও, পলিস, এরিডস, নেখের ইত্যাদি শহরগুলো গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে নগরায়ণ নীল নদের উচ্চ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরও কিছু পরে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 2,500 - 1,500 অব্দের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও ইরাবতী উপত্যকায় হরপ্পাকে কেন্দ্র করে এক উন্নত নগর-সভ্যতা জন্মলাভ করে। আরও কিছু পরে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 1500-র কাছাকাছি সময়ে চীনের হোয়াংহো অববাহিকায় নগরায়ণ ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টজন্মের কয়েকশ শতাব্দী আগে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে ইউকাটান গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোয় নগরসভ্যতা বিকাশলাভ করে। এদের মধ্যে মেক্সিকোর মায়া সভ্যতাই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

6.3.1 প্রাচীন-মধ্য যুগ (খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে 1650 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) [The Ancient-Medieval Period (A.D. 0 to 1650)]

অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে পৃথিবীতে 133 থেকে 300 মিলিয়ান লোক বাস করতেন। বিভিন্ন সূত্র ও

পরোক্ষ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এইরকম একটা অনুমান করা হয়েছে। সে যাই হোক, এবার সেই সময়কার — অর্থাৎ প্রায় 2,000 বছর আগেকার — জনবসতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সময়টা ছিল গ্রীক-রোমীয় যুগ (Greek-Roman Age)। এটা আবার ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারেরও যুগ। এই সময় নগর ও সংস্কৃতি তিনটি প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবন্ধ হয়েছিল। চীন ও হান্ বংশের নেতৃত্বে বিবদমান সমস্ত রাষ্ট্রগুলো চীনে একীকরণ হয়েছিল। ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্য সমস্ত উত্তর ভারত ও দক্ষিণে দাক্ষিনাত্য থেকে 10 উঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের অংশ ও ইউরোপের অনেকাংশ রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

প্রতিটি সাম্রাজ্যেই বিরাট সংখ্যক জনতা বাস করতেন, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে। এখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে জনসংখ্যা 100 থেকে 140 মিলিয়ন (Trewartha, 969) ছিল। দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মূল চীনা ভূখণ্ড। মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্তান ও ভিয়েতনামকে নিয়ে গঠিত এই চীন সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা খ্রিস্টীয় 2 সালে (A. D. 2) 57.7 মিলিয়নের পৌঁছেছিল। চীন সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত ফুঁকিনকে বাদ দিয়ে চীনের বর্তমান সীমানায় অবস্থিত। 18-টি প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 55 মিলিয়ন। ''হান্ চীনের'' সম্ভবত তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা অব-আর্দ্র ও প্রায় শুষ্ক উত্তর অঞ্চলে, বিশেষত হোয়াংহো বদ্বীপ অঞ্চলে বাস করতেন। জনবসতির তৃতীয় কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সম্রাট অগাস্টাসের রোম সাম্রাজ্য। এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় 54 মিলিয়ন। এটা ঠিক যে এই বিরাট সংখ্যক জনতাকে নিয়ে রোম প্রশাসনের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না, কারণ এই প্রশাসন ব্যক্তিসাম্যে বিশ্বাস করত না।

ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে রোমান সাম্রাজ্যকে বাদ দিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার শুষ্কাঞ্চলের বাসিন্দারা প্রধানত এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতেন। সমগ্র মধ্য এশিয়ার 48,00,000 বর্গকিমি এলাকায় খুব সম্ভবত 5 মিলিয়নের কম লোক বাস করতেন। খ্রিস্টীয় যুগের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা ও জনবন্টন সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে। তবে 600 খ্রিস্টাব্দে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা 18-19 মিলিয়নের মত ছিল, এর মধ্যে আরবে বাস করতেন 1 মিলিয়ন, সিরিয়ার 4 মিলিয়ন, মেসোপটেমিয়ায় 9.1 মিলিয়ন ও উচ্চভূমিতে 4.6 মিলিয়ন জনতা।

উপরের তিনটি অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য স্থানের জনবন্টন সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। খাদ্যসংগ্রাহকরা এ্যাংলো-আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ইউরেশিয়ার সরলবর্গীয় বনাঞ্চলের কিছু জায়গা জুড়ে বাস করতেন। বেশির ভাগ কৃষি-জনতা বাস করতেন ক্রান্তীয় ল্যাতিন আমেরিকা, দক্ষিণাংশ বাদে সম্পূর্ণ আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ ছাড়া সর্বত্র। রোমান সাম্রাজ্যে জনঘনত্ব খুব বেশি ছিল, কারণ সেখানে নগরায়ণ ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। এছাড়া বহুদূরব্যাপী বাণিজ্য এখানকার অর্থনীতির একটা অঙ্গ ছিল।

6.3.2 মধ্য যুগ (The Medieval Period)

মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক (1650 খ্রিঃ) শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা থেকে মিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই বৃদ্ধির হার খুব ধীরে ধীরে ঘটেছে। এক অঞ্চলের বৃদ্ধির হার অন্য অঞ্চলের বৃদ্ধির হারের সমান ছিল না, বা বৃদ্ধির হার সব সময়েই একরকম ছিল না। আবার কিছু কিছু দুর্যোগপূর্ণ বছরে মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে যেত। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা ও জনবৃদ্ধির হার একইরকম ছিল— 1600 খ্রিঃ চীনে 150 মিলিয়ন লোক বাস করতেন। খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে এই সময় (1600 খ্রিঃ) পর্যন্ত জনসংখ্যা 2 থেকে 3 গুণ বেড়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে হিন্দুস্থানে লোকসংখ্যা খুব ধীরগতিতে বেড়েছিল। সাধারণ বছরগুলোতে এই বৃদ্ধির

হার ছিল ধীরগতিতে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের বছরগুলোতে বেশি মৃত্যুহার এই বৃদ্ধির হারকে ম্লান করে দিত।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মহামারীর দরুন তা কমে যায়। উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে চতুর্দশ শতাব্দীতে উপরোক্ত কারণে জনসংখ্যা খুব কমে যায়। সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগে আল্পস্ কাপেথিয়ান পর্বতের উত্তর জনসংখ্যা বেড়েছিল, কারণ বন পরিষ্কার করে কৃষকেরা বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই দেখা যায় জুলিয়াস সীজারের সময় যে জার্মানীর জনসংখ্যা ছিল 2 থেকে 3 মিলিয়ন, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে তা বেড়ে দাঁড়াল 17 মিলিয়ন। অনুরূপভাবে স্লাভজাতি-অধ্যূষিত পূর্ব-মধ্য ইউরোপে 1000 খ্রিঃ 8.5 মিলিয়ন লোক বাস করতেন, 1700 খ্রিঃ তা বেড়ে দাঁড়াল 18 মিলিয়ন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপ (গ্রীক, স্পেন ও ইতালি বাদে যেখানে জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল) ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে জনসংখ্যা কম হারে বেড়েছিল, যদিও বৃদ্ধির হারে আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব চীন, দক্ষিণ জাপানের পলিগঠিত নিম্ন সমভূমি, মেসোপটেমিয়া, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকা বিশেষত নীল উপত্যকা, মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ, ল্যাতিন আমেরিকার কিছু স্থানে বিশেষত মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পেরু-বলিভিয়া আন্দিজ অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি ছিল।

6.3.3 বর্তমান যুগ (1650 খ্রিঃ-র পর) (The Modern Period after 1650)

আমরা আগেই দেখেছি যে একসময় কৃষিবিপ্লব জনবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে শিল্পবিজ্ঞান বিপ্লব এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। তবে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার একদিকে যেমন চাষবাস বা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় জোয়ার এনেছিল, তেমনি মৃত্যুহার রোধ করে জনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছিল। 1950 থেকে — অর্থাৎ তিনশ বছরে — লোকসংখ্যা বেড়েছিল 5 গুণ। তবে 1850 থেকে 1950 এই এক শতাব্দীর মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল একটু বেশি। চিত্র 2.3(b), শতকরা 100 ভাগ। Dudley Stamp-এর Our Developing World থেকে পৃথিবীর (1650 - 1950 খ্রিঃ-র মধ্যে) জনবৃদ্ধির শতকরা হারটি তুলে দেওয়া হল ঃ

বছর	% বৃদ্ধির হার	বছর	% বৃদ্ধির হার
1650-1750 }		1800-1850	29.2
1700-1750 }	16.8	1850-1900	37.3
1750-1800	24.4	1900-1950	53.9
		1950-2001	143.4

1900-1950 এই পঞ্চাশ বছরে যদিও বৃদ্ধির হার 53.9 শতাংশ হয়েছে, তবুও বৃদ্ধির হার সব দশকে সমান ছিল না [চিত্র 6.3(a)]। কারণ, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1914-1918 ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939-1945) ঘটেছে। তাতে বহু প্রাণহানি ঘটেছে, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের মৃত্যু। এছাড়া 1930-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দা জনবৃদ্ধিকে প্রতিহত করেছিল। 1950-এর পর থেকে পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও আধুনিক চিকিৎসার প্রসার এর জন্য দায়ী [চিত্র 6.3(b)]। 1820 সালের মধ্যে পৃথিবীর 1000 জনসংখ্যা, মিলিয়নে পৌঁছেছিল। 1930 সাল নাগাদ তা হল 2,000 মিলিয়ন, 1960 সালে 3,000 মিলিয়ন, 1975 সালে 4,000 মিলিয়ন ও 1996 সালে 5,804 মিলিয়ন। বলা

যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যা 1,000 মিলিয়নে পৌঁছাতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিল, 2,000 মিলিয়নে পৌঁছাতে মাত্র 100 বছর, 3,000 মিলিয়ন হতে প্রায় 30 বছর, আর 4,000 মিলিয়ন হতে মাত্র 15 বছর লেগেছে। 2001 সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা 613.7 মিলিয়ন হয়েছে (চিত্র 6.4)। সারণি 2.2-তে প্রায় 350 বছরের জনসংখ্যার চিত্রটি তুলে ধরা হল।

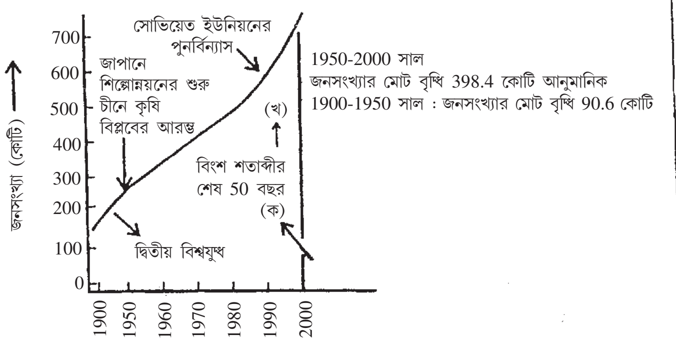

চিত্র 6.3(a) ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা (1900-2000)

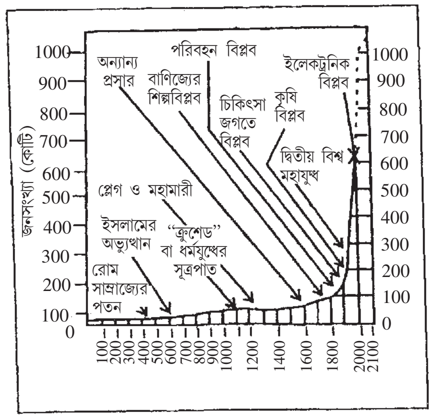

চিত্র 6.3(b) ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকে 2100 পর্যন্ত

(উৎস ঃ Lamn, R. D., Hard Choices. 1985 ও Corson, W. H, (Ed), The Global Ecology Handbook, 1990)

সারণি 6.2 ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা (1650 খ্রিঃ থেকে 2001 খ্রিঃ)

খ্রিঃ	জনসংখ্যা (কোটি)	খ্রিঃ	জনসংখ্যা (কোটি)
1650	54.5	1950	240.0
1750	72.8	1960	298.6
1800	90.6	1970	361.2
1850	100.0	1980	442.7
1900	161.0	1984	476.3
		1996	580.4
		2001	613.7

1951 সালে U. N. O. থেকে প্রকাশিত "The Future Growth of World Population" পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীর 2,500 মিলিয়ন জনসংখ্যা পূর্ণ হতে 2,00,000 বছর লেগেছিল। কিন্তু আর 2000 মিলিয়ন লোকসংখ্যা পূরণ হতে মাত্র 30 বছর লাগবে। Trewartha যথার্থই বলেছেন যে পৃথিবীর জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বড় রকমের জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বড় রকমের পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যা

বৃদ্ধির এই হার বহুদিন ধরে চলতে পারে না। গণতত্ত্ববিদরা (Demographers) সকলে একমত যে এই অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধি এক বিলাসিতা এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের (Population Explosion) অবস্থা সৃষ্টি করবে।

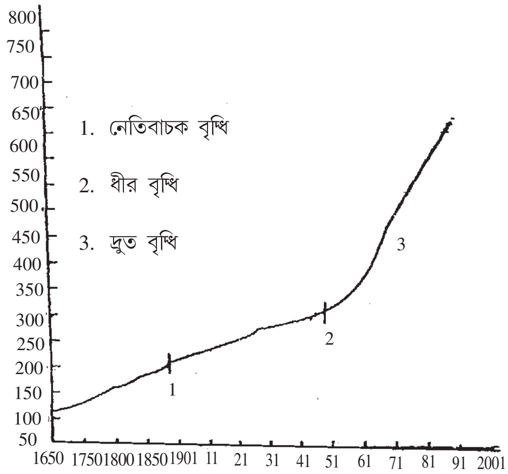

চিত্র 6.4 ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1650-2001)

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার নিয়ে আলোচনা করলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত দু'দশকে এই বৃদ্ধির হার পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হারকে বেশি নাড়া দিয়েছে। সারণি 6.3 থেকে তা সহজেই পরিষ্কার হবে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়রাও যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়েছেন। শুধুমাত্র নিজেদের মহাদেশেই নয়, মহাদেশের বাইরে যেখানে তারা উপনিবেশ গড়ছেন, সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

সারণি 6.3 ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি ঃ 1650 - 2001 (কোটিতে)

মহাদেশ	1650	1750	1900	1950	1960	1970	1980	1990	2001
আফ্রিকা	10.0	9.5	12.4	22.4	28.2	36.4	47.6	63.3	81.8
উঃ আমেরিকা	0.1	0.1	8.1	16.6	19.9	22.6	25.2	27.8	31.6
ল্যাতিন আমেরিকা	1.2	1.1	6.3	16.6	21.7	28.3	35.8	44.0	52.5
এশিয়া	30.0	48.0	94.0	140.3	170.3	214.7	264.2	318.6	372
ইউরোপ	10.0	14.0	40.0	54.9	60.5	65.6	69.3	72.2	72.7
ওশেনিয়া	0.2	0.2	0.6	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	3.1
পৃথিবী	55.0	72.9	161.4	252.1	302.2	369.5	444.4	528.5	613.7

অবশ্য বর্তমান শতাব্দীতে এই বৃদ্ধির হার বেশ কিছুটা কমে গেছে (সারণি 6.3)। বর্তমানে রাশিয়ার এই (C.I.S.) অংশ বাদে ইউরোপের জনসমষ্টি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র 12 শতাংশ। কিন্তু 1920 সালে এই ভাগ ছিল

18 শতাংশ। সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি দুই আমেরিকার (উত্তর ও দক্ষিণ) জনসংখ্যার 10 শতাংশের বেশি বেড়েছে। নিচের সারণিতে (সারণি) মহাদেশগুলোর অন্তর্বর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলে ধরা হল।

সারণি 6.4 ঃ মহাদেশসমূহের অন্তর্বর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার

মহাদেশ	1750-1800	1800-1850	1850-1900	1900-1950	1950-1980	1980-2001
এশিয়া	0.4	0.5	0.3	2.0	1.8	2.0
আফ্রিকা	0.01	0.1	0.4	2.4	2.9	3.6
উত্তর আমেরিকা	—	2.7	2.3	4.1	0.6	1.3
ল্যাতিন আমেরিকা	0.08	0.9	1.3	2.9	2.7	2.3
ইউরোপ	0.4	0.6	0.7	0.8	0.2	0.2
ওশেনিয়া	—	—	—	1.8	1.3	1.7
পৃথিবী	0.4	0.5	0.5	0.8	1.8	2.9

সারণি 6.4 যা আমাদের চোখে পড়ে, তা হল পৃথিবীর অনুন্নত (আফ্রিকা) ও উন্নয়নশীল (দঃ আমেরিকা ও এশিয়া) মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার। এই সব ক'টি মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে মৃত্যুহার কমে গেল, কিন্তু সেই তুলনায় জন্মহার বেশি থেকে গেল। বিগত দু'শো বছরে এই সব মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ঔপনিবেশিকদের দৌলতে বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি পায়। ফলে এখানে মৃত্যুহার কমে যায়। কিন্তু জন্মহার বেশি থেকে যায়। যেমন বলা চলে ভারতে গড়ে একজন নারী 3 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এর মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। শহরাঞ্চলে এই হার কিছুটা কম, আবার উত্তর ভারতের চারটি রাজ্যে এই হার 5 জন। আফ্রিকায় গড়ে একজন নারী 6 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এদের মধ্যে 2/3 জন শিশু-সন্তান মারা যায়। পৃথিবীতে মৃত্যুহার কমার একটি বড় কারণ হল শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমে যাওয়া। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই কঠোরভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মহাদেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল হল চরম দারিদ্র্য, বেকারী, অনাহার ও অপুষ্টি।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনের গতির মধ্যে সংগতি রয়েছে। ইউরোপে কিছু দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কাছাকাছি। কানাডা ও ওশেনিয়ায় এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। স্বভাবতই সেখানে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, দক্ষিণ আমেরিকায় জনবৃদ্ধির একটি কারণ হল সেখানকার অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে মানুষের মনে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ, অর্থাৎ আগামী দিনের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বলে সেখানকার বাসিন্দারা মনে করেন। আশার কথা হল, এশিয়া, দঃ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র দেরীতে হলেও জনাধিক্যের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের কিছু দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য বেশ কিছু সরকারী প্রকল্প চালু রয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনবার হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে— (i) 8000 খ্রিঃ পূঃ, (ii) 1750 খ্রিঃ এবং (iii) 1950 খ্রিঃ (Rubenstein,

1990)। প্রতিবারই নতুন নতুন কৌশলের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। কলা-কৌশলের অগ্রগতি মানুষকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, কলাকৌশলের এই অগ্রগতি পৃথিবীকে আরোও বেশি জনসংখ্যা ধারণ করার ক্ষমতা জোগালো। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি (i) প্রথমবার কৃষিবিপ্লব, (ii) দ্বিতীয়বার শিল্পবিপ্লব এবং (iii) তৃতীয়বার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিপ্লবের ফলে সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যতদিন গেছে, ততই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। মানুষের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে মাত্র 0.0015 শতাংশ। আর বর্তমান তা দাঁড়িয়েছে 1.7 শতাংশ। অবশ্য এই বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান হয়নি। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৃদ্ধির হারে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

6.4. ভারতের জনসংখ্যা ঃ গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা (Introduction)

পৃথিবীর 3 শতাংশের কম স্থান জুড়ে থাকা ভারতবর্ষে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 16 শতাংশ লোক বাস করেন। বিশ্বে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় এই দেশ আগামী দিনে প্রথম স্থানাধিকারী হবে।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Growth of India's Population)

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা তিনগুনেরও বেশি বেড়েছে। চলতি শতাব্দীর ভারতের জনমিতি-ইতিহাসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট সময়ে ভাগ করা যায়—(1) নিশ্চল (stagnant), (2) ধীর বৃদ্ধি ও (3) দ্রুত বৃদ্ধির যুগ (চিত্র 6.1)। 1901 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত সময়কে **নিশ্চল যুগ** বলা চলে। এই সময় জনসংখ্যা মাত্র 12 মিলিয়ন বেড়েছে (236 থেকে 248 মিলিয়ন)। এই সময় মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট বেশি মৃত্যুহারের জন্য দায়ী ছিল। এই সময় জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই ছিল প্রতি হাজারে 40-র বেশি। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল কম।

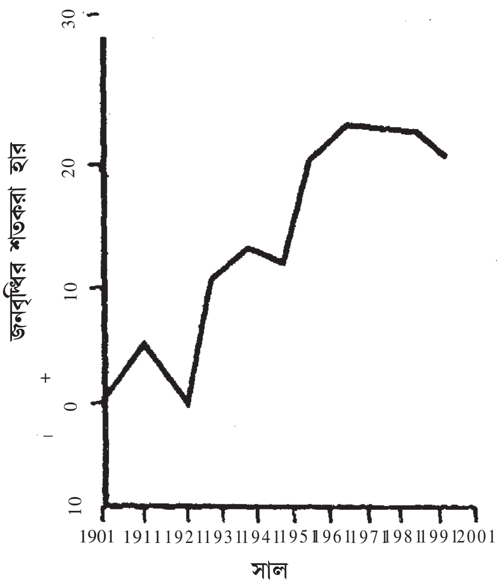

চিত্র 7.1 ঃ ভারতের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (1901-2001)

1921-র জনগণনাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ এর পর থেকে জনসংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 1921 থেকে 1951 সালের মধ্যে জনসংখ্যা 112 মিলিয়ন বেড়েছিল (248 থেকে 360 মিলিয়ন, সারণি 0.7)। ভারতের জনমিতি চিত্রে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, কারণ এই

সময় মহামারী, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে বণ্টন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিকে খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও চিকিৎসা পরিষেবার প্রচুর উন্নতি ঘটানো হয়েছিল। সারণি 7.2 থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে 1921 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যু হার ছিল 47 আর 1951 সালে তা কমে হল 27। দ্রুত মৃত্যুহার কমার দরুন 1921 থেকে 1951 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার ধীর বৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে (1951) 40 জন।

সারণি 6.5 ঃ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1905-2001)

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	পূববর্তী দশকে % বৃদ্ধি	বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	পূর্ববতী দশকে % বৃদ্ধি
1921	236	–	1951	360	+13.3
1911	249	+5.7	1961	439	+21.5
1921	248	– 0.3	1971	548	+24.8
1931	276	+11.0	1981	685	+24.7
1941	315	+14.2	1991	844	+23.5
			2001	1.027	+21.3

সারণি 6.6 ঃ ভারতের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (1901-2001)

বছর	প্রতি হাজারে জন্ম হার	প্রতি হাজারে মৃত্যু হার	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার	বছর	প্রতি হাজারে জন্ম হার	প্রতি হাজারে মৃত্যু হার	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার
1911	49	43	6	1961	42	23	19
1921	48	47	1	1971	37	15	22
1931	46	36	10	1981	34	12	22
1941	45	31	14	1991	31	11	20
1951	40	27	12	2001	26	8	18

1951 সালকে ভারতের জনমিতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ 1951-র পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা অভাবিত হারে বেড়েছে। 1951 থেকে 2001 সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিন গুণের বেশি বেড়েছে (360 থেকে 1027 মিলিয়ন)। গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধির হার হল শতকরা দুভাগ। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু উন্নয়নমূলক কার্যসূচি, পর্যাপ্ত খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার দরুন মৃত্যু হার কমে গিয়ে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 27 থেকে কমে 11 হল। এই সময়কার জনমিতি ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল জন্মহার ধীরে ধীরে কমে ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার দ্রুততালে কমে গিয়েছিল, ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারও বেশি ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাওয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির কিছু ফল লক্ষ্য করা যায়। ভারতের জনসংখ্যায় তরুণ জনতার হার বাড়ছে। এ দেশের 36.5 শতকরা ভাগ জনসংখ্যার বয়স 15 বছরের কম। জন্মহার বেশি ও আয়ুষ্কাল বাড়ায় পুনরুৎপাদন বয়সপুঞ্জে জনসংখ্যার শতকরা হার বাড়ছে, যার পরোক্ষ ফল হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সর্বোপরি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

একনজরে ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

(India's Population, Health and Education at a glance)

2025 সালের সম্ভাব্য জনসংখ্যা	ঃ	133.02 কোটি
জনসংখ্যা দ্বিগুন হওয়ার তারিখ	ঃ	2031 সাল
জনসংখ্যা (2001)	ঃ	102.70 কোটি
পুরুষ	ঃ	53.13 কোটি
মহিলা	ঃ	49.57 কোটি
একদশকে বৃদ্ধি (91-01)	ঃ	22.34%
মোট বৃদ্ধি (1991-01)	ঃ	18.3 কোটি
শহুরে জনসংখ্যা (2001)	ঃ	27.78%
গ্রামীণ জনসংখ্যা (")	ঃ	27.22%
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে)	ঃ	324 কোটি
সাক্ষরতা (2001)	ঃ	65.38%
পুরুষ	ঃ	75.85%
মহিলা (1997)	ঃ	54.16%
গড় আয়ু	ঃ	62.6
হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা	ঃ	933
প্রজনন হার (1997)	ঃ	3.3%
জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	ঃ	9.0 (1998)
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	ঃ	70 (1999)
শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে	ঃ	70 (1999)
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	ঃ	98 (1999)
মাতৃত্বকালীন মৃত্যু (একলক্ষ শিশু পিছু)	ঃ	410 (1980-99)
চিকিৎসাগত কারণে ভ্রূণ হত্যা	ঃ	6.14 লক্ষ (1999)
60 বছর বেশি বয়সী (জনসংখ্যার অংশ)	ঃ	6.1%
60 বছর বয়সের আগেই মৃত্যু (জনসংখ্যার অংশ)	ঃ	30%
প্রতিবন্ধী (জনসংখ্যার অংশ)	ঃ	0.2 (1995-96)
এইড্স রোগী (2000)	ঃ	37 লক্ষ
শ্রমিক বিভাগ		
কৃষি	ঃ	64
শিল্প	ঃ	16

ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ঃ প্রাথমিক স্কুল 46.1

মধ্যস্তরের স্কুল 38 : 1 মাধ্যমিক স্কুল 32 : 1 উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল 35 : 11

কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় 21 : 11

টেলিফোন - 27 (প্রতি হাজার), ফ্যাক্স - 0.1 (প্রতি হাজারে)। রেডিও — 80 (প্রতি হাজারে)।

প্রকাশিত বই — 1 (প্রতি লক্ষে)।

ডাক্তারপিছু মানুষ — 2.437। নার্স পিছু মানুষ — 3.333। গবেষক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ — 0.3 (প্রতি হাজারে)।

এ দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় জনবৃদ্ধি হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে এ দেশে জনবৃদ্ধির হার বেশি, তবুও শহরাঞ্চল অথবা গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধির হার কম। 1971-81-র দশকে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 19 ও 46 শতাংশ। যেহেতু ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন গ্রামবাসী, তাই জনসংখ্যার নিরিখে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলেই ঘটেছে। গ্রাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের ভূমি সম্পদের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। গ্রামে বেকারত্ব ও অর্থ-বেকারত্ব ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। যদি গ্রামে শিল্পায়নের দ্বারা অর্থনীতির উন্নতি ঘটানো না যায়, তবে সেখানকার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে, শহর এলাকা, বিশেষ করে বড় শিল্পকেন্দ্র ও জেলা-সদর শহরে, বাইরে থেকে প্রচুর লোকজন এসে বসবাস করছেন। ফলে ঐ সব স্থানের জনবৃদ্ধি দ্রুততালে ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে দেশের উর্বর কৃষিজমির ওপর লাগাম-ছাড়া নগরায়ণ ঘটে চলেছে। শহরে বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধের ঘাটতি ঘটেছে, দুষণের জন্য পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে ভারতবর্ষ জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে, তবুও দেশের বিভিন্ন অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের একই ধাপে নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে কেরালার মৃত্যুহার হল প্রতি হাজারে 5.9, কিন্তু জন্মহার 19.8। এই রাজ্যটি জনমিতি পরিবৃত্তকালের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব) দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমদিকে রয়েছে।

সারণি 6.6 থেকে আমরা গত দু'দশকের জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটি চিত্র পাচ্ছি ঃ (i) স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার (1981-91) জনবৃদ্ধির হার কম ঘটল। 1971-81-র দশকে দেশের জনবৃদ্ধি ছিল 24.66 শতাংশ, 1981-91-র দশকে তা গিয়ে দাঁড়াল 23.5; (ii) দেশের বিভিন্ন অংশে জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। নাগাল্যাণ্ডে গত দু'দশকে যেখানে জনবৃদ্ধি ঘটেছে +6.0 শতাংশ, সেখানে সিকিমে –22.3 শতাংশ, আর কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ে বৃদ্ধির হার হল –33.4 শতাংশ, (iii) ভারতবর্ষের 28-টি রাজ্যের মধ্যে 16-টি রাজ্যের বৃদ্ধির হার নেতিবাচক (negative)। অন্যান্য রাজ্যে বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি নয়। চারটি রাজ্যের (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ) জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। রাজস্থানের বৃদ্ধির হার (– 4.9%) জাতীয় গড়ের (–1.2%) চেয়ে অনেক কম। পক্ষান্তরে বিহার (– 0.15%) ও উত্তরপ্রদেশের (0.01%) বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছু কম, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বৃদ্ধির হার +1.5।

সাধারণত কেন্দ্রশাসিত এলাকাসমূহ হল শহরাঞ্চল। স্বভাবতই গ্রাম থেকে লোকজন এখানে এসে বসবাস করেন। ফলে এখানে জনবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু 1981–91-র দশকে সাতটির মধ্যে চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (শহর) মধ্যে চণ্ডীগড় সব থেকে শিক্ষিত শহর। চণ্ডীগড়ের জনসাধারণ ক্ষমতা তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে পাঁচকুলা ও মেহেলী নামে উপনগরী সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কারণের জন্য চণ্ডীগড়ের জনবৃদ্ধি কমেছে।

জেলাস্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের মোট জেলার 10 শতাংশের (45-টি জেলা) বৃদ্ধির হার (1981-91) 15 শতাংশের কম। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর 14-টি জেলা দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এগিয়ে আছে। এর পরের স্থান হল কেরালা (7), কর্ণাটক (6), মহারাষ্ট্র (4), উত্তরপ্রদেশ (3), পাঞ্জাব (2), হিমাচলপ্রদেশ (2), বিহার, গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের (প্রতিটির 1-টি করে জেলা)।

6.4.1 1991-2001 সাল পর্যন্ত জনবৃদ্ধি (Growth of Population from 1991 to 2001)

এই দশকে জনবৃদ্ধি আরও হ্রাস পেয়েছে। এই দশকে জনবৃদ্ধি ছিল 21.34 শতাংশ যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় 2.52 শতাংশ (23.86-21.34) কম (সারণি 6.7)। 1981-91 দশক থেকে যে জনবৃদ্ধির হার কমেছিল, তা বর্তমান দশকে আরও কমে গেল।

রাজ্যগুলোর মধ্যে পূর্বের ন্যায় এবারও কেরলে সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে, মাত্র 9.42 শতাংশ, যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় 4.88 শতাংশ কম। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে এই দশকে 15 শতাংশের কম বৃদ্ধি ঘটেছে তারা হল তামিলনাডু (11.19%), অন্ধ্রপ্রদেশ (13.86%) ও গোয়া (14.89%)। গোটা দেশের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে, তা হল পূর্ববর্তী দশকের (24.20%) তুলনায় 10.84 শতাংশ কম (বর্তমান দশকে 13.86 শতাংশ)।

জাতীয় গড়ের (21.34 শতাংশ) তুলনায় কম ও জনবৃদ্ধির রাজ্যগুলো হল ত্রিপুরা (15.74 শতাংশ), ওড়িশা (15.94), কর্ণাটক (17.25), হিমাচলপ্রদেশ (17.53), পশ্চিমবঙ্গ (17.84), ছত্তিশগড় (18.06), অসম (18.85) উত্তরাঞ্চল (19.2) এবং পাঞ্জাব (19.76)। এভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে ভারতের 28-টি রাজ্যের মধ্যে 13-টির জনবৃদ্ধির হার 20 শতাংশের কম। এইসব রাজ্যগুলোর মধ্যে আছে সমস্ত দক্ষিণের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরার মতো পূর্বের রাজ্যগুলো, উত্তরাঞ্চল, নতুন সৃষ্ট উপজাতি রাজ্য ছত্তিশগড় এবং কৃষিসমৃদ্ধ পাঞ্জাব।

এর বিপরীতে রয়েছে নাগাল্যান্ড যেখানে জনবৃদ্ধির হার ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, 64.6 শতাংশ। (1991-2001) পূর্বের দশকের (56.8 শতাংশ) তুলনায় এই বৃদ্ধির হার 8.3 শতাংশের বেশি। এই ধরনের বৃদ্ধির পেছনে কারণ হল এখানে সবসময় দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে অভিবাসন (immigration) ঘটে চলেছে। অন্যান্য যে সব রাজ্যে যেখানে জনবৃদ্ধির হার বেশি, সেগুলো হল সিকিম (32.98 শতাংশ) , মণিপুর (30.08) মেঘালয় (29.94) মিজোরাম (29.18), জম্মু ও কাশ্মীর (29.04), বিহার (28.43), রাজস্থান (28.33), হরিয়ানা (28.06), অরুণাচলপ্রদেশ (26.15), উত্তরপ্রদেশ (25.8), মধ্যপ্রদেশ (24.34), ঝাড়খণ্ড (23.18), মহারাষ্ট্র (22.57), ও গুজরাত (22.48)। উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ ছোট রাজ্যে ওই জনবৃদ্ধি বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে সীমান্তের ওপার থেকে ওই সব রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। এটি খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং এটি শাসকদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র পণ্ডিচেরী (20.56), ও লাক্ষাদ্বীপে (17.19), ঐ জাতীয় গড়ের (21.34), চেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে। দাদরা ও নগর হাভেলী-তে জনবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে (59.2)। এর পরের স্থান হল (55.59), দিল্লী (46.31), চণ্ডীগড় (40.33), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (26.94), । যেহেতু অধিকাংশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো হল শহরাঞ্চল, তাই সেখানে কাজের সন্ধানে গ্রামীণ জনতার অভিবাসন ঘটেছে।

সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাতটির মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনবৃদ্ধির হার কমেছে। কেবলমাত্র দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দমন ও দিউ-তে জনসংখ্যা বেড়েছে।

দেশের পক্ষে এটাই বড় সন্তোষের কথা যে 28-টির মধ্যে 21-টিতে জনবৃদ্ধির হার কমেছে (সারণি 6.7)। এ থেকে মনে হয় যে জনসংখ্যা হ্রাস একটি বড় অঞ্চল জুড়েই ঘটেছে। যে সমস্ত রাজ্যে খুব বেশি জনহ্রাস ঘটেছে, সেগুলো হল উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা (–18.56 শতাংশ), অরুণাচল প্রদেশ (–10.68), মিজোরাম (–10.52), এবং দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশ। সে তুলনায় যেসব রাজ্যে বর্তমান দশকে জনবৃদ্ধি বেশি ঘটেছে সেগুলো

সারণি 6.7 ঃ ভারত — জনবৃদ্ধির হারের পরিবর্তন ঃ 1981-2002 (% হারে)

রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	1981 - 91	পরিবর্তন 1971 - 81 এবং 1981 - 91	1991 - 2001	পরিবর্তন 1981 - 1991 এবং 1991 - 2001
ভারত	**23.86**	**–8.8**	**21.34**	**–2.51**
রাজ্য				
নাগাল্যাণ্ড	56.08	+6.03	64.44	+8.31
সিকিম	28.47	-22.30	32.98	+4.51
মণিপুর	29.29	-3.17	30.02	+0.73
মেঘালয়	32.86	+0.82	29.94	-2.92
মিজোরাম	39.70	-8.85	29.18	-10.52
জম্মু ও কাশ্মীর	30.34	-0.77	20.04	-1.30
বিহার	23.38	-0.52	28.43	+5.05
রাজস্থান	28.44	-4.53	28.33	-0.11
হরিয়ানা	27.41	-1.35	28.06	+0.65
অরুণাচল প্রদেশ	36.83	+1.68	26.15	-10.68
উত্তর প্রদেশ	25.55	-0.01	25.80	-0.25
মধ্যপ্রদেশ	27.24	+1.57	24.36	-2.90
ঝাড়খণ্ড	24.03	N.A.	23.18	-0.85
মহারাষ্ট্র	25.73	+1.21	22.57	-3.16
গুজরাত	21.19	-6.48	22.48	+1.29
পাঞ্জাব	20.81	-2.92	29.76	-1.05
উত্তরাঞ্চল	24.23	N.A.	19.20	-5.03
আসাম	24.24	+0.22	18.85	-5.39
ছত্তিশগড়	25.73	N.A.	18.06	-7.67
পশ্চিমবঙ্গ	24.73	+1.56	17.84	-6.89
হিমাচল প্রদেশ	20.79	-2.92	17.53	-3.26
কর্ণাটক	21.12	-5.63	17.25	-3.87
ওড়িশা	20.06	-0.11	15.94	-4.12
ত্রিপুরা	34.30	+2.38	15.74	-18.56
গোয়া	16.08	-10.66	14.89	-1.19
অন্ধ্রপ্রদেশ	24.20	+1.10	13.86	-10.34
তামিলনাড়ু	15.39	-2.11	11.19	-4.20
কেরালা	14.32	-4.92	9.42	-4.90
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল				
দাদরা ও নগর হাভেলী	33.57	-6.21	59.20	+25.63
দমন ও দিউ	28.62	+2.55	55.59	+26.97
দিল্লী	51.45	-1.95	46.31	-5.41
চণ্ডীগড়	42.16	-33.39	40.33	-1.83
আন্দামান ও নিকোবর	48.70	-15.23	26.94	-21.76
পণ্ডিচেরী	33.64	+5.49	20.56	-13.08
লাক্ষাদ্বীপ	**28.47**	**+1.94**	**17.19**	**+11.28**

Source : Census of India 2001, Provisional Populations Totals, 2001 Table G-1 and Census of India, 1991 : Final Population Totals, India, Paper Ii of 1992, p.44

হল উত্তরপ্রদেশ (0.25), হরিয়ানা (0.65), মেঘালয় (0.7), গুজরাত (1.29), সিকিম (4.5), বিহার (5.0), এবং নাগাল্যাণ্ড (8.3)। উপরের তথ্য থেকে বলা যায় যে নাগাল্যাণ্ড ও বিহার ছাড়া প্রায় সর্বত্র-ই জনবৃদ্ধির হার খুব সামান্য এবং মনে হয় যে আগামী দিনেও ভারতে জনবৃদ্ধির হার কম ঘটবে। আরও বলা যেতে পারে ভারতে জনমিতি বিবর্তনের এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, এই দশকের (1991-201) একটি দুশ্চিন্তার কারণ গর্ভপাত, বিশেষ করে অবাঞ্ছিত কন্যাশিশু হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এতে করে হয়তো পরিবারে আয়তন সীমিত রাখা যাচ্ছে। কিন্তু বয়ঃপুঞ্জের কন্যা-শিশুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে। কন্যা ভ্রূণহত্যা আগামী দিনে আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্য নষ্ট করবে এবং সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বন্ধ করে দিয়েছে, তবুও এই ঘটনা আজও ঘটেই চলেছে।

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারত-ই প্রথম 1951-52 সালে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছে তবুও পৃথিবীর মধ্যে জনবৃদ্ধি ঘটাতে এই দেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হল আমাদের জনসংখ্যা নীতি দেশের জনগণের মানসিকতার ওপর গভীর ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও নীতি নির্ধারকদের (Policy-marker) যুক্তির মধ্যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। তাই যাদের জন্য পরিকল্পনা, তাদের এ ব্যাপারে জড়াতে না পারলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, জনগণের জন্য তৃণমূল স্তর থেকে পরিকল্পনা হাতে নিলে তা সফল হবে। তাই দেখা যায় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশ তা বেড়েই চলেছে। বস্তুত, গত 40 বছরের (1951-91) মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা দুগুণেরও বেশি বেড়েছে। ম্যালথাসের মতে প্রতিটি দেশের জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে 30-35 বছরের মধ্যে দু'গুণ হওয়ার প্রবণতা থাকে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

6.5. জনসংখ্যার পরিবর্তন (Demographic Transition)

ভূমিকা (Introduction)

"Dictionary of Human Geography" থেকে জনসংখ্যা বিবর্তন সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল— "A general model describing the evolution of levels of fertility and mortality over time. It has been devised with particular reference to the experience of developed countries."

মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশ ও সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়। ফলে মানব উন্নয়নের সূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের প্রকৃতিও বদলে যায়। সময় ও দেশের প্রভাব মানুষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 1929 সালে Warren Thompson সর্বপ্রথম জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থনীতির প্রভাবের কথা বলেছেন। তাঁর মতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রত্যেকটির নিজস্ব ধরন ও চাহিদা আছে। সুতরাং কৃষিভিত্তিক সমাজের যাচাহিদা, তা কখনই শিল্পভিত্তিক সমাজে থাকতে পারে না। ফলে কৃষি যত উন্নত হয়, সমাজ ও অর্থনীতি ততই মজবুত হতে থাকে। এইভাবে যখন শিল্প ও বাণিজ্যের চূড়ান্ত অগ্রগতি হয়, তখন সমাজের অর্থনীতি আরও মজবুতভাবে গড়ে ওঠে। আসলে Thompson (1929), Notestein (1945), Blacker (1947) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে জন্মহার ও মৃত্যুহারের সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিবিড় সম্পর্ক আছে

এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই জনসমষ্টির বিবর্তন তত্ত্ব (Demographic Transition Theory) গড়ে উঠেছে।

6.5.1 জনসংখ্যার বিবর্তন তত্ত্ব (Demographic Transition Theory)

আলোচ্য তত্ত্বটির মূল কথা হল, কোন দেশের সমাজ ও অর্থনীতি অর্থাৎ মানব উন্নয়নের অবস্থার সাথে ঐ দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে (চিত্র 4.1) । যেমন—

(i) উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার = কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি = সমাজ ও অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা।

(ii) উচ্চ জন্মহার ও নিম্নমুখী মৃত্যুহার = শিল্পোন্নয়ন = উন্নয়নের শুরু

(iii) নিম্নমুখী জন্মহার ও নিম্নমুখী মৃত্যুহার = শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি এবং আধুনিক কৃষি = সমাজ ও অর্থনীতির সবল অবস্থা।

(iv) নিম্ন জন্মহার ও অতি নিম্নমুখী মৃত্যুহার প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা হ্রাস সবল অর্থনীতি দুর্বল হওয়ার সম্ভবানা (চিত্র 6.8) (এটি সাধারণত একটি সাময়িক অবস্থা)

Beaujeu-Garnier (1966)-এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মূলতঃ তিন ধরনের —

(1) ক্রমবর্ধমান প্রাচীন প্রকৃতির হার।

(2) ক্রমবিবর্তিত হার বা নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার।

(3) পরিণত হার বা আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায়।

জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী তিন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

পর্যায়/হার	জন্ম	মৃত্যু	জনবৃদ্ধি	অর্থনীতি
1. প্রাক-শিল্পীয় (Pre-Industrial)	বেশি (High)	বেশি পরিবর্তনশীল	স্থানু থেকে কম (Static to low)	আদিম বা কৃষিভিত্তিক
2. নবীন-পাশ্চাত্য (Early-Western)	বেশি (High)	কমের দিকে	বেশি	মিশ্র
3. আধুনিক-পাশ্চাত্য (Modern-(Western)	নিয়ন্ত্রিত, সাধারণভাবে কম থেকে মাঝারি	কম	কম থেকে মাঝারি	শহর শিল্পাশ্রিত ও মিশ্র

অনেক সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য 3-টির বদলে 4-টি স্তরের (Stage বা Phase) কথা বলেছেন (চিত্র 6.2)। এঁদের মতে **প্রথম স্তরে** জন্মহার ও মৃত্যুহারে দুই-ই বেশি থাকায় জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে। **দ্বিতীয় স্তরের** বৃদ্ধি আরও বেশি রকমের। কারণ এই স্তরে জন্মহার বেশি, কিন্তু মৃত্যুহার কম (চিত্র 4.3)। অনুন্নত দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রথম স্তরে এবং ভারত দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে। **তৃতীয় স্তরে** জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব একটা ঘটে না। একে **Platean Phase বা মালভূমি স্তর** বলে। মালভূমির পৃষ্ঠদেশের

উচ্চতা যেমন মোটামুটি একই থাকে, তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেখাচিত্র (Graph) একই থাকে। স্পেন, ইতালি প্রভৃতি দেশ এই স্তরে রয়েছে। এখানে জন্ম ও মৃত্যুর হার দুই-ই কম, তাই বৃদ্ধির হারও বেশ কম। **চতুর্থ স্তরে**

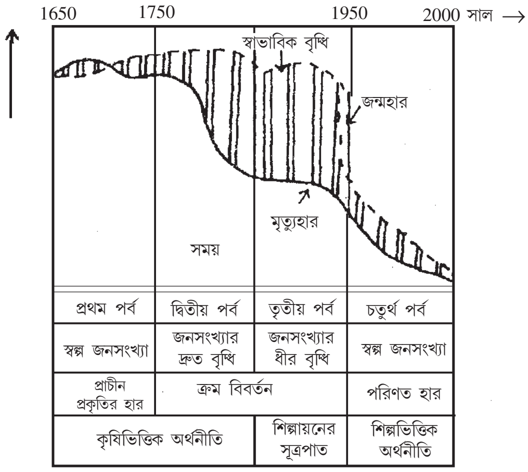

চিত্র 8.1 ঃ জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃতি ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক

জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়। জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক [চিত্র 6.4 (ক)] সুইডেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ এই স্তরে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই দেশগুলোতে জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা কমই বলা চলে। অতি উন্নতমানের জীবনযাত্রা ও সামাজিক অবস্থা এর জন্য দায়ী। বয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা বয়স্ক নারী এদেশগুলোতে বেশি।

6.5.2 জনমিতি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় এবং গঠনের কারণ

বিভিন্ন ধরনের জনমিতি বিবর্তনের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জনসংখ্যায় বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই জনমিতি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ এবং তাদের সম্ভাব্য কারণগুলো নিচে আলোচিত হল ঃ

6.5.2.1 প্রথম পর্ব ঃ ক্রমবর্ধমান প্রাচীন প্রকৃতি হার (First Stage : Increasing Primitive Types)

এটি জনসমষ্টির বিবর্তন বা এর প্রথম পর্ব। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(i) জন্মহার ও মৃত্যুহার অত্যধিক (প্রতি হাজারে 30-এর বেশি)

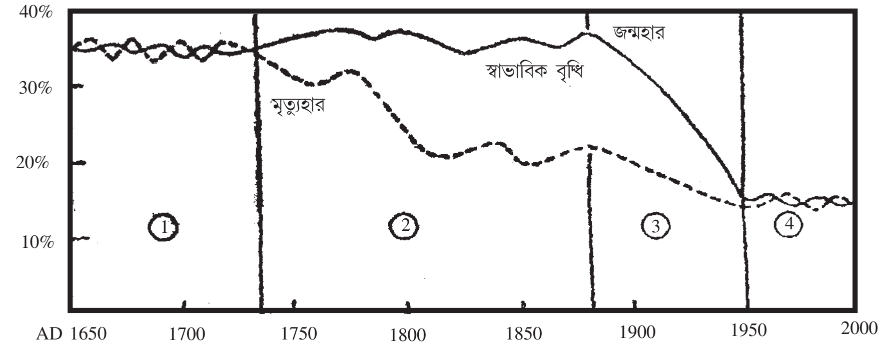

চিত্র 6.5 ঃ 1650 সাল থেকে পৃথিবির জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল। চারটি পর্যায়ে এখানে দেখানো হয়েছে। (1) জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, (2) প্রথমদিকে জনবৃদ্ধি, (3) শেষদিকের জনবৃদ্ধি (4) জন্ম-মৃত্যুর হ্রাস-বৃদ্ধি।

(ii) জন্মহার ও মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

(iii) দেশীয় বা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক প্রগতি ও মানব উন্নয়নের হার মন্থর।

(iv) অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ও সমাজ কৃষিভিত্তিক। এটি নিম্নবিত্ত-উন্নয়নশীল দেশের প্রচলিত আর্থ সামাজিক অবস্থা।

আফ্রিকা মহাদেশের গ্যাবন, জাম্বিয়া, সোয়াজিল্যাণ্ড ইত্যাদি প্রাচীন প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ। প্রাক-অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট বৃটেনে এই ধরনের অবস্থা ছিল (চট্টোপাধ্যায়, 2001)।

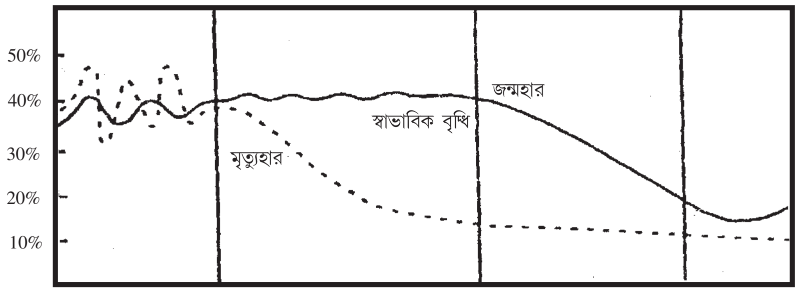

চিত্র 8.1 ঃ পৃথিবীর জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল (সাধারণ)

6.5.2.2 দ্বিতীয় পর্ব ঃ ক্রমবিবর্তিত হার বা নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার (Second Stage : Transitional Type)

আলোচ্য পর্যায়টি জনসমষ্টির বিবর্তন বা Demographic Transition এর দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— (i) *ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত হার* (Increasing Transitional Type) ও (ii) *আয়ত্তাধীন বিবর্তিত হার* (Controlled Transitional Type)।

ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত হার (Transitional Type) পৃথিবীর সেই সমস্ত দেশে দেখা যায় যেখানে অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও শিল্প ও পরিষেবামূলক সুযোগ-সুবিধে ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(i) জন্মহার বেশি এবং অধিকাংশ অনিয়ন্ত্রিত।

(ii) চিকিৎসার সুযোগ বাড়ার জন্য মৃত্যুহার আস্তে আস্তে কমে যায়।

(iii) জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য জনসংখ্যা এই পর্যায়েও বাড়তে থাকে।

(iv) দেশীয় বা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো ধীরে ধীরে মজবুত হয়।

(v) অর্থনীতি প্রধানত মিশ্র প্রকৃতির। যা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য।

এশিয়া মহাদেশের চীন, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি **রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত** (Incresing Transitional) জনসংখ্যার দেশ।

বিপরীতভাবে, **আয়ত্তাধীন বিবর্তিত** হারের দেশগুলোতে (Controlled Transitional Type) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। অর্থাৎ এখানে

(i) জন্মহার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।

(ii) সম্প্রসারিত চিকিৎসার সুযোগে মৃত্যুহার আরও কমে।

(iii) উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার আয়তন ক্রমহ্রাসমান।

(iv) মজবুত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রবর্তন।

(v) আলোকপ্রাপ্ত জনসমাজ (চট্টোপাধ্যায়, 2000)

স্পেন, গ্রীস, ইতালি, রুমানিয়া অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলো হল **আয়ত্তাধীন বিবর্তিত হারের দেশ।**

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুসারে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ পাশ্চাত্য পর্যায়ের দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (i) **গুয়াতেমালা হার।**, (ii) **থাইল্যাণ্ড হার** ও (iii) **চিলি হার।**

(i) গুয়াতেমালা হার (Guatemala Type) ঃ কোন দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 20-30 এর মধ্যে থাকলে, তাকে গুয়াতেমালা হার বলে। এই হারের দেশগুলোতে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, কারণ এখানে জন্মহার (গড় প্রতি হাজারে 43 জন) মৃত্যুহারের চেয়ে (গড়ে 15 জন) স্বাভাবিকভাবেই বেশি। সুতরাং জন্মহার অনিয়ন্ত্রিত। জন্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং এসব দেশে কমানোর জন্য চিকিৎসার সুযোগ কম। যেমন— পূর্ব এশিয়া (বাংলাদেশ, পাকিস্তান), মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ।

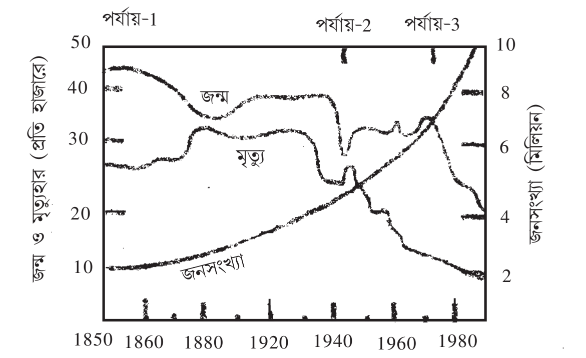

চিত্র 8.1 ঃ ভারতের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (1901-2001)

(ii) **থাইল্যাণ্ড হার (Thailand Type) ঃ** কোন দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 25–35-এর মধ্যে থাকলে তাকে থাইল্যাণ্ড হার বলে। এই হারের দেশগুলোতে জন্মহার বেশি ও চিকিৎসা সুযোগ বেশি থাকার জন্য মৃত্যুহার কম। মানব উন্নয়নের প্রকৃতি অনুসারে এই হার গুয়াতেমালা হারের চেয়ে অনেকটাই বিপরীত। যেমন শ্রীলঙ্কা, পুরোর্তোরিকো।

(iii) **চিলি হার (Chile Type) ঃ** কোন দেশের জনসংখ্যার হাজারে 27, মৃত্যুহার 8.4 এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 19 জন হলে তাকে **চিলি হার** বলে। যেমন চিলি এখানে জন্মহার ক্রম-হ্রাসমান এবং মৃত্যুহার কম [চিত্র 6.8 (ক) ও (খ)]। তবে জন্মহার এখনও মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি। গুয়াতেমালা হারের দেশগুলোতে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল নিয়ে লোকজনের বিশেষ উদ্বেগ নেই, চিলি হারের দেশগুলো কিন্তু তার চেয়ে অনেক উন্নত। এখানে জনগণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সামাজিকভাবে সচেতন।

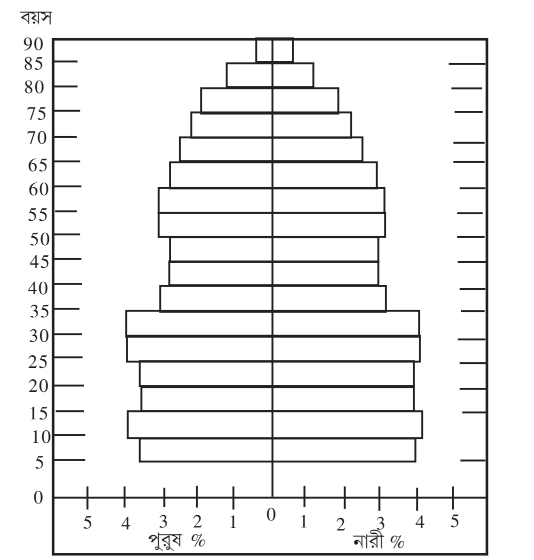

চিত্র 8.1 ঃ ডেনমার্কের জনসংখ্যা পিরামিড

6.5.2.3 তৃতীয় পর্ব ঃ পরিণত হার (Third Stage : Mature Type)

এটি জনসংখ্যা বিবর্তনের তৃতীয় পর্ব। এই পর্যায় জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এটি উন্নত অর্থনীতি ও সচেতন সমাজব্যবস্থায় পরিচয় বহন করে। এই জাতীয় সমৃদ্ধ অর্থব্যবস্থায় জনসাধারণ ধনী, শিক্ষিত ও সচেতন হয়। ফলে—

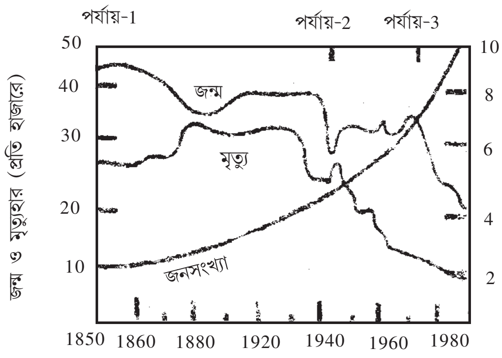

চিত্র 8.1 ঃ চিলির জনমিতি পরিবৃত্তকালের মডেল ও জনসংখ্যা পিরামিড। ১৯৩০-র দশকের চিলি জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মৃত্যুহার হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। কিন্তু জন্মহার প্রতি হাজারে ৩০ শতাংশ ছিল। ১৯৬০-র দশকে সরকারি জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির দরুণ জন্মহার হঠাৎ করে কমে যায়।
অবশ্য ১৯৭৯ সালে ঐ নীতি বদলের ফলে ১৯৮০-র দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(i) জন্মহার সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

(ii) জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান ও সমপ্রায় অবস্থায় পৌঁছোয় অর্থাৎ জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়।

ডেনমার্ক, জাপান, নরওয়ে, জার্মানি ইত্যাদি ক্রমহ্রাস জন্মহারের দেশ।

উল্লেখ্য যে, ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা বা স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশগুলোতে যৌথ পরিবার দেখা যায় না এবং নারী ও পুরুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা সমান হয়।

নবীন পাশ্চাত্ত পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হারের মত এক্ষেত্রে কয়েকটি উপবিভাগ লক্ষ্য করা যায়।

পর্যায় 1 (Stage 1) ঃ যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে বা তার কম। দক্ষিণ ইউরোপের অনেকগুলো দেশ এই পর্যায়ে পড়ে। যেমন— পর্তুগাল (9%0), রাশিয়া (9%0), যুগোশ্লোভিয়া (9.3%0), স্পেন (107%o), এছাড়া অস্ট্রেলিয়া (104%o), নিউজিল্যাণ্ড (12%o), কানাডা (8.1%o) প্রভৃতি দেশও এই পর্যায়ে পড়ে।

পর্যায় 2 (Stage 2) ঃ এরপরও রয়েছে কিছু দেশ যেখানে জন্ম (প্রতি হাজারে প্রায় 12) ও মৃত্যু (প্রায় 10) দুই-ই খুব কম। ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হাজারে দুই জন 2। উত্তর ইউরোপের দেশসমূহ, যেখানে অস্ট্রিয়া (0.6%o), বেলজিয়াম (1.2%o), যুক্তরাজ্য (1.9%o) (চিত্র 4.6) ও সুইডেন (3%o) এর মধ্যে পড়ে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে (U.S.A) স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 5.6। সাম্প্রতিককালে (1987) যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার বিগত বছরগুলোর তুলনায় দারুণভাবে কমে গেছে। উচ্চশিক্ষা ও জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার বাসনার দরুন এদেশের যুবক-যুবতীরা বিয়ে স্থগিত রাখছে এবং এটিই জন্মহার হ্রাসের কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

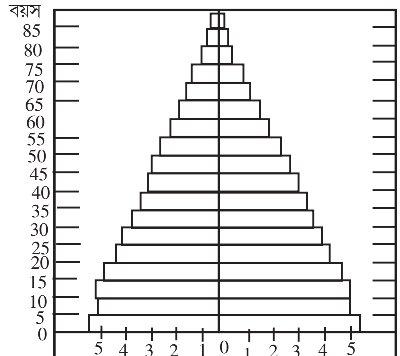

চিত্র 8.1 ঃ চিলির জনসংখ্যা পিরামিড

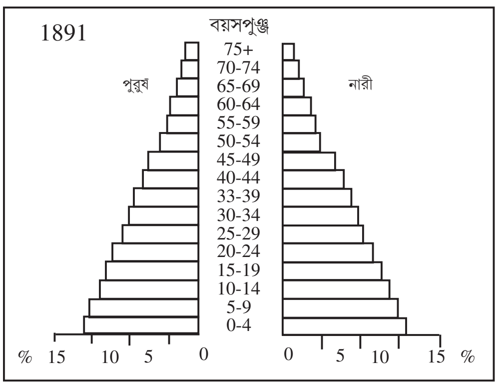

চিত্র 8.1 ঃ যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা পিরামিড।

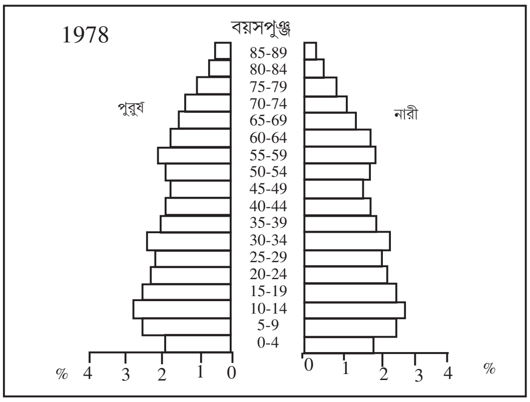

চিত্র 8.1 ঃ যুক্তরাজ্যের (U.K) জনসংখ্যা পিরামিড, 1978

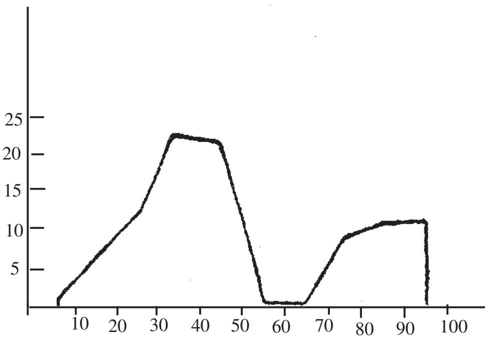

6.5.2.4 চতুর্থ পর্ব ঃ নেতিবাচক বৃদ্ধিহার (Fourth Stage : Negative Growth Rate)

পরিণত হার-এর পাশাপাশি কতগুলো দেশ রয়েছে যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নেতিবাচক অর্থাৎ জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহারের বেশি। যেমন জার্মানি (2.3%), লাক্সেমবার্গ (2.1%), অস্ট্রিয়া এবং বেলজিয়ামও এই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি। জনসংখ্যা বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ে উপনীত দেশসমূহে সাধারণত জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় একই থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য। এই অবস্থাকে বলা হয় **শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি** (Zero Population Growth)।

এভাবে জনসংখ্যা বিবর্তন একটি দেশকে বিবর্তন চক্রের প্রথম অবস্থায় নিয়ে আসে (অতি সামান্য বা কোন বৃদ্ধি না হওয়া)। এই পর্যায়ে জনবৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 15 জন। ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড এই চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বগ (Bogue) অবশ্য এই জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্য নাম দিয়েছেন। সেগুলো হল ঃ

(1) **প্রাক-পরিবর্তন অবস্থা** (Pre-transitional i.e., Stage A - High Potential Growth),

(2) **পরিবর্তন অবস্থা** (Transitional i.e., Stage B - Transitional Growth)

(3) **পরিবর্তন-উত্তর অবস্থা** (Post-transitional i.e., Stage C-Incipient Decline)।

Bogue অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়কে আরও তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা—

2 (a) **পরিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থা (Early-transitional)** ঃ এই অবস্থার দেশগুলোতে সাধারণভাবে মৃত্যুহার কমার দিকে, জন্মহার বৃদ্ধির দিকে। মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জন্মহার সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে।

2 (b) **পরিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থা (Mid-transitional)** ঃ এই ধরনের দেশগুলোতে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়েই হ্রাস পাচ্ছে যদিও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় খুব বেশি।

2 (c) **পরিবর্তনের শেষ অবস্থা (Late-transitional)** ঃ এই ধরনের দেশগুলোতে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়েই হ্রাস পাচ্ছে যদিও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় খুব বেশি। মৃত্যুহার কমার গতি মন্থর। জন্মনিরোধক বড়ি ও প্রযুক্তি সমাজের সর্বস্তর গ্রহণ করেছে। জন্ম ও মৃত্যুহারের তফাৎ যথেষ্ট কমার জন্য জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। শীঘ্রই এই বৃদ্ধি শূন্যে পৌঁছবে (চিত্র 6.8)।

জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

Thompson এবং Notestein-এর মত আরো অনেকে জনসংখ্যার ক্রমবির্বতনের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন C. P. Blacker, Karl Sax ও Adoph Landry.

C. P. Blacker-এর 'পঞ্চ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি' (Five Stages of Population Growth)

Blacker মনে করেন জনসংখ্যা পাঁচটি পর্যায়ে বাড়ে (চিত্র 6.8)। এই পর্যায়গুলো হল নিম্নরূপ ঃ

A. উচ্চ স্থানু জনসংখ্যা ঃ এই পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি। অতি অনুন্নত অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য থাকে। ফলে জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ে। অনেক সময় মৃত্যুহার বাড়ার ফলে জনসংখ্যাও কমে যায়। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর ফলে বহু লোকের মৃত্যু হয়। Blacker-এর মতে 1900 সাল নাগাদ চীন ও ভারতবর্ষ উভয়েই এই পর্যায়ে ছিল। Blacker আরো দেখিয়েছেন যে 1930 সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় 22 শতাংশ জনতা এই পর্যায়ে ছিলেন।

B. **প্রাক্-বিস্তার পর্যায় ঃ** যখন (ক) দুর্ভিক্ষ-মহামারীর প্রকোপকে কিছুটা বাগে আনা সম্ভবপর হলো, (খ) চিকিৎসা ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে কিছুটা সম্প্রসারিত হলো এবং (গ) প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কমে আসল, তখন জনতার মৃত্যুহার নিশ্চিতভাবে কমতে শুরু করলো। মৃত্যুহারের পরিবর্তন হলো ঠিকই, কিন্তু জন্মহার প্রায় একই রকম থেকে গেল। ফলে জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো। Blacker-এর মতে 1930 সাল নাগাদ পৃথিবীর প্রায় 40% জনসংখ্যা এই পর্যায়ে ছিল। ঐ সময়ে আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশই এই পর্যায়ে ছিল। এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলো এই সময় তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

C. **শেষ বিস্তার পর্যায় ঃ** মৃত্যুহার কমে যাবার বেশ কিছুকাল পর জন্মহারও কমতে শুরু করে। লক্ষ্যণীয় যে এই সময় মৃত্যুহার দারুণভাবে কমে গেছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও খুব বেশি। এই পর্যায়ে সাধারণ মানুষ বেশি সংখ্যক সন্তানের অসুবিধের কথা বুঝতে শেখেন। সরকারি প্রচার সীমিত সংখ্যক সন্তানের পক্ষে শুরু হয়। Blacker-এর মতে 1930 সাল নাগাদ 22% মানুষই এই পর্যায়ে ছিলেন। উন্নতিশীল দেশগুলো এই পর্যায়ে প্রবেশ করার মুখে।

D. **নিম্ন স্থানু জনসংখ্যা ঃ** জন্মহার ও মৃত্যুহার খুব কাছাকাছি এবং উভয়ই খুব কম। প্রথম পর্যায়ের মত এখানে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল। তবে প্রথম পর্যায়ে খুব বেশি মৃত্যুহারের জন্য যে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হতো তা এই পর্যায়ে ঘটে না। প্রায় প্রতিটি মানুষই জন্ম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী। জীবনযাত্রার মানও খুব উচ্চ। Blacker-এর মতে 1930 সাল নাগাদ পৃথিবীর প্রায় 14% জনতা এই পর্যায়ে ছিলেন। যেমন পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলো, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও অসমানিয়া। এই পর্যায়ে Notesein-এর তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ Incipient Decline স্তরের সঙ্গে তুলনীয়।

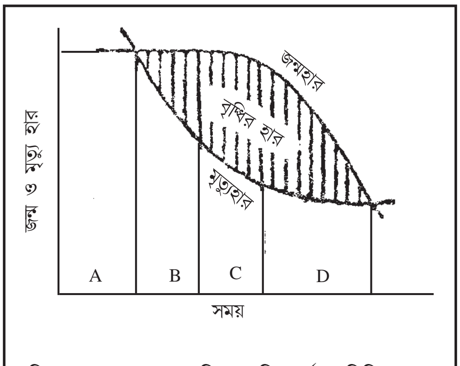

চিত্র 8.1 ঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ক্রান্তি পর্যায়ে বিভিন্ন স্তর

E. **হ্রাসমান জনসংখ্যা ঃ** এই পর্যায়টি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির দিক থেকে অতি উন্নত বা অতি অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই দেখা যেতে পারে। জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশি হলে জনসংখ্যা কমে যায়। অতি উচ্চ জন্ম এবং মৃত্যুহারেও এ ধরনের ঘটনা ঘটবার যেমন সম্ভাবনা, তেমনি অতি নিম্ন জন্ম এবং মৃত্যুহারেও এ ধরনের ঘটনা

ঘটতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে সব দেশ 'একটিমাত্র সন্তান' আদর্শ (one-child-norm) গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটতে পারে। 1930-এর আগে বিশ্বের জনসংখ্যার এই পর্যায়ে ছিলেন (মজুমদার, 1991)।

Karl-Sax-এর মতে জনসংখ্যাক্রমবিবর্তনের চারটি পর্যায় (চিত্র 4.9) আছে। এগুলো হল ঃ

I. উঁচু স্থানু পর্যায় ঃ (High Stationary Stage) ঃ এই পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার কমতে আরম্ভ করলেও জন্মহার প্রথম পর্যায়ের মত উঁচুস্তরেই রয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না।

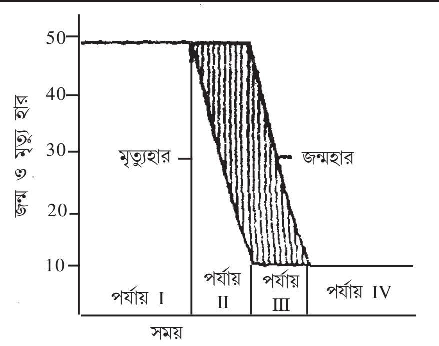

চিত্র 8.1 ঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ক্রান্তি পর্যায় Karl Sax-এর মতে)

II. প্রাক্-বিস্ফোরক বৃদ্ধি ঃ (Early Explosive Increase) মৃত্যুহার কমতে আরম্ভ করলেও জন্মহার প্রথম পর্যায়ের মত উঁচুস্তরেই রয়ে গেছে। জনসংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়ছে।

III. পরবর্তী বিস্ফোরক বৃদ্ধি ঃ (Late Explosive Increase) জন্মহার কমতে আরম্ভ করেছে, মৃত্যুহার খুবই কম, প্রায় স্থিতিশীল অথবা খুব আস্তে আস্তে কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও অবস্থা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার কারণ জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে ব্যবধান।

IV. নিম্ন স্থানু পর্যায় ঃ (Low Stationary Stage) এই পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার প্রয় নিম্ন সীমায় পৌঁছেছে। ফলে জন্ম ও মৃত্যুহারে আবার সমতা ফিরে এসেছে।

6.6. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health and Nutrition)

WHO-র মতে শুধুমাত্র নিরোগ থাকাই নয়। সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গল ও স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের গুণাগুণের একটি দিক যা যথোপযুক্ত চিকিৎসার পরিষেবার দ্বারা আরোও বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

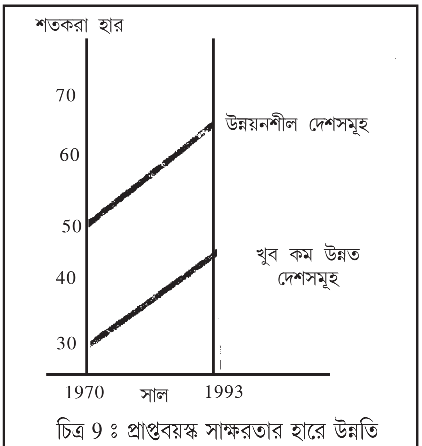

চিত্র 9 ঃ প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারে উন্নতি (Hussain অনুকরণে)

জনসংখ্যার কত ভাগ লোক স্বাস্থ্য ও পরিষেবার আওতায় এলেন তার সূচক হল ঐ পরিষেবা ও জনতার অনুপাত। এ বিষয়ে World Bank-র World Development Indicators, 2000-এ যে সূচকগুলোর কথা বলা হয়েছে, তা হল—

(a) স্বাস্থ্য খাতে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কত শতাংশ খরচ করা হয়;

(b) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ কত;

(c) প্রতি 1000 জন-পিছু কতজন ডাক্তার আছেন;

(d) প্রতি 1000 জন-পিছু হাসপাতালে কতগুলো শয্যা পাওয়া যায়;

(e) রোগী ভর্তির হার কত;

(f) শিশুদের নিরোগ রাখার প্রকল্পে (Child immunization) যোগদানের হার প্রভৃতি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে— স্বাস্থ্যখাতে প্রতিটি দেশের সরকার বহুভাবে খরচ করে। কেন্দ্রীয় এবং

সারণি 6.8 : 1990 থেকে 1998 সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা

স্বাস্থ্য সূচক	উন্নয়নশীল দেশ			উন্নত দেশ
	নিম্নবিত্ত দেশ	নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ	উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ	
স্বাস্থ্যখাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) শতকরা ব্যয়ের পরিমাণ (%) প্রতি বছরে	4.2%	5.3%	6.3%	9.8%
স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ প্রতি বছরে	23 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1,150 টাকা	102 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 5,100 টাকা	335 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 16,750 টাকা	2.585 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা
প্রতি 1,000 মানুষ-পিছু ডাক্তারের সংখ্যা	1 জন	2 জন	1.5 জন	2.8 জন
প্রতি 1,000 মানুষ-পিছু হাসপাতালের সংখ্যা	1.8 টি	5.1 টি	3.2 টি	7.4 টি
প্রতি 100 জন মানুষ-পিছু রোগী ভর্তির হার (%)	5 জন	15 জন	6 জন	15 জন
1 বছরের কম বয়সী প্রতি 100 জন শিশুর মধ্যে কত জনকে সংক্রামক রোগ প্রতিহত করার টিকা দেওয়া হয়েছে (%), যেমন হাম, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া	80 জন	89 জন	92 জন	100 জন
টিটেনাস	82 জন	89 জন	82 জন	100 জন

রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে টাকার বরাদ্দ করা হয়। বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা থেকে দরকার বোধে সরকার ধার নেয়। তাছাড়া নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য টাকা খরচ করে। World Bank-এর 2000-র প্রতিবেদন অনুসারে 1990 থেকে 1998 সালের মধ্যে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের মান ভাল ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বার্ষিক মাথাপিছু আয় অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (a) নিম্নবিত্ত দেশ*; (b) নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ**; (c) উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ***।

এছাড়া রয়েছে উচ্চবিত্ত উন্নত দেশ যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় 9,380 ডলারের বেশি।

* মাথাপিছু বার্ষিক আয় 760 ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় 38,000 টাকা)।

** মাথাপিছু বার্ষিক আয় 761-3030 ডলার (38,000-1.5 লক্ষ টাকা, প্রায়)।

*** মাথাপিছু বার্ষিক আয় 3031-9,360 ডলার (1.5-4.68 লক্ষ টাকা, প্রায়)।

এবার দেখা যাক্ উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে কিরকম ব্যয় করে বা উভয় প্রকার দেশগুলোতে পরিষেবার ধরন কিরকম।

সারণি 6.2 থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট ব্যয়ের মাত্র 5.3% স্বাস্থ্যখাতে খরচ করা হয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এই খরচের পরিমাণ গড়ে 9.8%। পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতে খরচের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি 13.9%, আর নাইজিরিয়াতে সবথেকে কম (0.7%)। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের পরিমাণ 5.2%।

WHO-র দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া বর্তমানে AIDS-এর মারাত্মক রোগ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগ থেকে প্রচুর প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সব দেশে সাধ্যমত ব্যবস্থা নিলেও রোগী-প্রতি চিকিৎসকের সংখ্যা এত কম যে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো ঠিকমত রূপায়ণ করা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকার ইথিয়োপিয়াতে প্রতি 72,000 জনে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র 1 জন। পক্ষান্তরে, ফ্রান্স, জার্মানির মত উন্নত দেশে প্রতি 500 জনের জন্য এক জন করে ডাক্তার রয়েছে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের ফলেও বিকাশশীল দেশগুলোতে রোগের প্রাদুর্ভাব ও শিশুমৃত্যুর হার বেশি WHO-র প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পৃথিবীতে প্রতি পাঁচ জনে একজন অকালে মারা যায়। সুষম খাবার না পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ শিশু মারা যায়।

সুতরাং মানব সম্পদের সার্বিক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রতিষেধক ও চিকিৎসার সুযোগগুলো জনসাধারণের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার (চট্টোপাধ্যায়, 2001)। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা নিচের সারণি (9.3) থেকে ধরা পড়ে।

সারণি 6.9 : 1995 থেকে 2000 সালের মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা

দেশ	স্বাস্থ্য			পুষ্টি	
	গড় আয়ু (বছর) (1995–2000)	শিশু-মৃত্যু (হাজার)	কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা (লক্ষ প্রতি)	প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালোরির যোগান (%)	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (Underweight Children) (%)
উন্নত দেশ					
যুক্তরাষ্ট্র	76.7	10	0.01	138	X
জার্মানি	76.7	7			148 X
যুক্তরাজ্য (%)	77.1	7	0.02	130	X
ফ্রান্স	78.8	9	0.01	143	X
জাপান	80.0	6	0.26	125	X
উন্নয়নশীল দেশ					
ভারত	62/4	115	0/36	101	53
বাংলাদেশ	58.1	115	–	88	67
পাকিস্তান	63.9	137	–	99	38

Source : World Resources, 1998-99

এছাড়া শহরাঞ্চলে প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের সব মানুষ উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ ভোগ

করেন। পক্ষান্তরে, ভারতে 70%, বাংলাদেশে 77% পাকিস্তান 77% মানুষ এই সুযোগ পান। এজন্য ঐ সব দেশের মানুষজন খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এজন্য তারা বিভিন্ন সংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহরবাসীর সংখ্যা কম। আর শহরবাসীরাই উন্নত পরিষেবার সুযোগ ভোগ করে থাকেন (সারণি 9.4)।

সারণি 6.10 ঃ মানুষের জীবনযাত্রার গুণমানের পার্থক্য

সূচক	সাল	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানী	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	জাপান	রাশিয়ান ফেডারেশন	ভারত	বাংলাদেশ	পাকিস্তান
শহরবাসীর সংখ্যা (%)	1997	77	87	89	75	78	77	27	19	35
শহরাঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ (%)	1995	–	100	–	100	–	–	70	77	53
মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগের বৃদ্ধি	1980 1996	1.8	–	2.6	1.7	2.9	–	.23	0.0	1.1
শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব (%)	1990–1996	–	–	–	3	–	66	68	40	

Source : *World Development Report. 1998-99*

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হল যে, পৃথিবীর বিকাশশীল দেশগুলোতে মানব উন্নয়নের হার খুব কম, আর এজন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসংখ্যা-সম্পর্কিত কারণগুলো যে দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

6.7. অনুশীলনী

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণগুলি লেখো।
2. মানুষের সংখ্যার অত্যধিক হারে বৃদ্ধির প্রধান কারণ কি?
3. ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কি প্রভাব পড়েছে, তা আলোচনা করো।
4. ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা করো।
5. জনসংখ্যা বিবর্তন তত্ত্ব আলোচনা করো।

6.8. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. পরিবেশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
2. Text book of Environmental Studies for Undergraduate Courses, Calcutta University, Edited by Professor Rathindranath Basu.
3. Model Questions and Answers on Environmental Studies, Ashis Mukhopadhyay.
4. সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরে পরিবেশ-বিদ্যা, ড. বিভাস গুহ
5. A Text book of Environmental Studies, E. Barucha.
6. প্রশ্নোত্তরে পরিবেশ-বিদ্যা. ড. এস. পি. আগরওয়ালা ও ড. এ. মুখোপাধ্যায়।
7. Study Material (NSOU), EGO 13, Block-1, EGO 10 Block-1.
8. Study Material (NSOU), EZO 7, Block-1.